গল্পের ফুলদানি–৭

বদরের বীর

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

গল্পের ফুলদানি ৭

বদরের বীর

গল্পের ফুলদানি ৭

বদরের বীর

সালাহ্উদ্দীন জাহাঙ্গীর

ইসলামী টাওয়ার [দোকান নং ২০]
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩ ৫০৮৭৪৩

গল্পের ফুলদানি ৭

বদরের বীর

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রচ্ছদ ও নামলিপি : কারুকাজ

মূল্য : ২০০ [দুই শত] টাকা মাত্র

BADARER VEER
by Salahuddin Jahangir

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash

মা'কে

মা'কে উৎসর্গ করার মতো বই এখনও লিখতে পারিনি, তাই সেভাবে কোনো বই তাকে উৎসর্গ করা হয়নি। নিজের অপারগতার প্রতি নিজেই বিরক্ত।

এ উৎসর্গপত্র অনেকটা নিজেকেই সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা– ভবিষ্যতে এমন বই লেখার, যে বইটা মায়ের হাতে দিয়ে বলতে পারবো– 'মা, আমি তোমার সেই ছেলে, যাকে তোমার মা (আমার নানি) আল্লাহর কাছে চেয়ে এনেছিলো।'

কৈফিয়ত

গল্প লিখেই যাচ্ছি লিখেই যাচ্ছি। গল্প লিখতে কোনো অনীহা আসছে না। লিখতে ভালো লাগে, তাই অনীহা বিষয়টি কখনো গল্পের নাগাল পায়নি।

হাতের কাছে, মনের কাছে কতো ইতিহাস জমা পড়ে আছে; সময়ের অভাবে লেখা হয়ে উঠে না। কিন্তু লেখার অপূর্ণ সাধ মনে রয়েই যায়। এ কারণে সময় পেলেই দুটো একটা করে গল্প লিখে ফেলি। এক সময় অনেকগুলো হয়ে গেলে পাঠকের মাহফিলে পেশ করি।

নবি-রাসূলদের ইতিহাস, সাহাবিদের ইতিহাস, তাবেয়িদের ইতিহাস, আউলিয়ার ইতিহাস, উলামা-ফুকাহার ইতিহাস, দিগ্বীজয়ী সিপাহসালারদের ইতিহাস, সফল মানুষদের অসংখ্য ইতিহাস আমাদের চারপাশে অগুনতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটু খুঁজে নিয়ে সুন্দর করে বলে দিলেই গল্প হয়ে যায়। আমাদের লেখকদের উচিত এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা। এ বিষয়ে কলম হাতে দৃঢ়পদে এগিয়ে আসা। তারা যদি না জাগে তবে কীভাবে সকাল হবে?

ইতিহাস অধ্যয়নে বাঙালির মুসলিম মনন সবসময়ই আগুয়ান। তবে ইতিহাসের পঠনসামগ্রীর বড় অভাব বাংলাভাষায়। আবার যা-ও আছে তা এমন কাঠিন্যের দ্যোতনায় সাজানো যে– পড়তে গেলে বিষম খেতে হয় ভীষণ।

এ কথা চিন্তা করেই লিখতে শুরু করেছিলাম 'গল্পের ফুলদানি সিরিজ'। খোদার অশেষ কৃপায় এর আগে এ সিরিজের আরও ছয়টি বই

প্রকাশ হয়েছে শুধু এ তাড়না থেকেই। শুধু ইতিহাস নয়; কিছুটা গল্প কিছুটা ইতিহাস। যাতে যে কোনো বয়সের যে কোনো পাঠক ইতিহাস পড়ার সময় যেন মুখ গোমড়া করে বসে না থাকেন।

প্রাঞ্জল ও সহজ গদ্যে লেখার কোশেশ আমার আজীবনের। তা সেটা যা-ই লিখি না কেন। আর গল্পের বেলায় তো ভাষা ও বাক্যের ব্যাপারে সর্বজনীন সহজবোধ্য রাখাটা লেখকের অন্যতম দায়িত্ব। সে চেষ্টাই করেছি গল্পগুলো লেখার সময়।

সর্বোপরি *নবপ্রকাশ* নিয়ে বলতেই হয়। *নবপ্রকাশ* ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস– এ তিন কিসিমের বই প্রকাশ করার মহান ব্রত নিয়ে প্রকাশনাশিল্পে নিজেদের কদম রেখেছে। আমি বরাবরই *নবপ্রকাশ*-এর এ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। আমাদের পাঠকমহল যখন দেশি আর ভিনদেশি বিভিন্ন বিধর্মী ও নাস্তিক লেখকের চরিত্রবিধ্বংসী বই পড়ে অধঃপতনের দিকে পা বাড়াচ্ছে, তখন *নবপ্রকাশ*-এর এমন উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে বৈকি। কেননা জ্ঞানের বিপ্লব জ্ঞান দিয়েই রুখতে হয়। কলমের বিরুদ্ধে কলম নিয়েই যুদ্ধে নামতে হয়। বইয়ের বিরুদ্ধে রাইফেল নিয়ে লড়াইয়ে নামলে পরাজয় অনিবার্য। ময়দানে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়তে হলে সমমানের বই-অস্ত্র নিয়েই নামতে হবে। এ হিসেবে– *নবপ্রকাশ*-এর উদ্যোগ ধন্যবাদ পাওয়ার দাবিদার।

তাদের ভবিষ্যতের প্রতিটি কাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হোক!

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর
ধামরাই, ঢাকা

সূচিপত্র

ফুলদানি গল্প সিরিজ ৭

বদরের বীর

কাফেলা মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এখান থেকে ইয়াসরিবের ঘরবাড়ি চোখে না পড়লেও বসতির পেছনের পাহাড়শ্রেণি দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের কার্নিশ গ'লে দু-একটা খেজুর গাছের পাতাও নজরে আসছে। আর একটুক্ষণ চললেই কাফেলা পৌঁছে যাবে ইয়াসরিব–মদিনাতুন্নবি, নবির শহরে।

কাফেলার সামনে নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং। তাঁর সঙ্গে সাহাবাদের একটি দল। সাহাবাদের নিয়ে কোনো এক অভিযান শেষে মদিনায় ফিরছেন। সবাই ক্লান্ত-শ্রান্ত। তবে মদিনার এক চিলতে দৃশ্য নজরে আসতেই সবার ক্লান্তি যেন উবে গেলো।

সামনেই ছোট্ট একটা উপত্যকা। কয়েকটি খেজুর আর বাবলা গাছ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে উপত্যকার এখানে-সেখানে। মরুপথে চলতে চলতে ক্লান্ত কোনো মুসাফিরের জিরিয়ে নেয়ার জন্য উমদাহ জায়গা। মরুর খাঁ খাঁ রৌদ্রদহন থেকে কিছুক্ষণের জন্য একটু শান্তির সুবাতাস পেতে অনেকেই যাত্রাবিরতি করে এখানে। গাছের ছায়া আর ছায়ার খানিকটা শীতল হাওয়া শরীর-মন দুটোই চাঙা করে দেয় মুসাফিরের।

সাহাবাদের দলটি উপত্যকার কাছাকাছি আসতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সবাইকে থামতে বললেন। এখানে কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করা হবে। রাসুলের একটি নিয়ম ছিলো– মদিনার বাইরের

অভিযান থেকে ফিরে এলে শহরের কাছাকাছি কোনো স্থানে যাত্রাবিরতি করতেন, যাতে কাফেলার লোকজন পরিপাটি হয়ে শহরে প্রবেশ করেন এবং শহরে যাদের স্ত্রী আছে তারাও তাদের আগমনের সংবাদ আগেই জানতে পেরে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন।

কাফেলার সবাই উপত্যকায় জড়ো হলেন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খেজুর কিংবা বাবলা গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন। মরুর হাওয়া এই ছোট্ট উপত্যকার গাছগাছালির স্পর্শে কিছুটা হলেও শীতল হয়ে যায়। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। বাতাসে পাতার ফিসফিসানি কানে আসছে। কয়েকটা পাখিও কিচিরমিচির করে ডাকছে বাবলা গাছের ডালে বসে।

হঠাৎই কাফেলার সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। কিসের যেন একটা ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। অদ্ভুত ঘ্রাণ। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন— সবাই একসঙ্গে পাচ্ছেন এ অদ্ভুত ঘ্রাণ। কিসের ঘ্রাণ? ধীরে ধীরে যেন খোশবুটা আরো তীব্র হচ্ছে। তারা এদিক-সেদিক তাকালেন— না, কোনো ফুল বা ফল নেই গাছগুলোতে। তাহলে কোথা থেকে আসছে এ মনমাতানো সুবাস?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেও পাচ্ছেন এ অপার্থিব সুবাসের লহরী। একজন সাহাবি রাসুলসমীপে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোথায় থেকে আসছে এমন অপূর্ব খোশবু!'

নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আশ্চর্যের কী আছে, তোমরা জানো না এখানে আবু মুআবিয়ার কবর আছে? তার কবর থেকেই আসছে এ খোশবু।'

পেছন ফিরে দেখা

হজরত আবু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। যার নাম ছিলো উবায়দা ইবনে হারিস মাতলুবি। বদর যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী চৌদ্দজন সাহাবির সৌভাগ্যবান একজন।

হজরত আবু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বনু আবদে মানাফের শাখাগোত্র বনু মোত্তালিব বংশের সন্তান। আত্মীয়তার সূত্রে

তিনি ছিলেন নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চাচা। বয়সে নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চেয়ে দশ বছরের বড়।

হজরত আবু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সেই সৌভাগ্যবানদের একজন, যারা ইসলামের প্রথম যুগে কালেমায়ে শাহাদাতের দীক্ষা গ্রহণ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন ইসলামের পতাকাতলে। ইসলাম গ্রহণের সময়ই তার বয়সের সূর্য ঢলে পড়েছিলো পশ্চিম দিগন্তে। বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন অনেকটা। তবুও ইসলাম গ্রহণ করে কুণ্ঠিত হননি কখনো। বীরদর্পে নিজের ধর্মান্তরের কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। কারো পরোয়া করতেন না। সত্যের দীপ্যমান আলোকবিভা বুকে ধারণ করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন জনসম্মুখে। এর জন্য তাকে সইতে হয়েছিলো অনেক নির্যাতন, অপমান, অসম্মান।

নবুয়তের সপ্তম বছরে কুরাইশরা যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও ইসলাম গ্রহণকারী সকল সাহাবায়ে কেরামকে সামাজিকভাবে বয়কট করে মক্কার পাশের এক গিরিপথে নির্বাসনে পাঠায়, তখন আবু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুও রাসুলের সঙ্গী হন। রাসুলের ভালোবাসায় নিজের সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে গিরিপথের জীর্ণ তাঁবুতে মানবেতর জীবনযাপনকে বেছে নেন। একটা দিনের জন্যও তিনি রাসুলকে ছেড়ে থাকেননি। রাসুলের সকল কাজে তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন।

গিরিপথে তিন বছরের নির্বাসন শেষ হলেও মক্কার কাফেররা মুসলমানদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করলো না। বরং দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেখে তারা অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। এ অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের জীবন বাঁচাতে তাদের বিভিন্ন দেশে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। কাউকে পাঠিয়ে দিলেন হাবশা (ইথিওপিয়া), কাউকে শাম (সিরিয়া) কাউকে-বা অন্য কোনো দেশে। কিন্তু আবু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কোথাও গেলেন না। রাসুল যেখানে যাবেন, তিনিও সেখানেই যাবেন। রাসুলকে ছাড়া তিনি কোথাও যাবেন না। তাতে যদি কাফেরদের অত্যাচারে তাকে মরতে হয়, তবে রাসুলের পাশে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করে নেবেন।

অবশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের ব্যাপারে মনস্থির করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবু মুআবিয়াকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। তিনি রাসুলের কথামতো নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে এলেন মদিনায়।

তিনি যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তার বয়স ষাটের কোটা পেরিয়ে গেছে। বয়স ষাট হলে কী হবে, তিনি তখনো ছিলেন তাগড়া শরীরের অধিকারী। বিখ্যাত বীর হিসেবে আরবজোড়া তার খ্যাতি ছিলো।

মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসে তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালমা উজলালি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে অবস্থান করেন। মক্কায় থাকতে নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে যখন ভাই ভাই বানিয়ে দেন, তখন তাকে হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। আর হিজরতের পর আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের যখন ভাই ভাই বানিয়ে দেন, তখন তাকে হজরত উমায়ের ইবনে হুমাম আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। মক্কা থেকে নিঃস্ব হয়ে চলে আসায় নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে ঘর বানানোর জন্য এক টুকরো জমিও দান করেছিলেন।

বদর প্রান্তরে

মদিনাজুড়ে যুদ্ধের ডামাডোল। মক্কার কাফেররা মদিনাতেও মুসলমানদের শান্তিতে থাকতে দিতে রাজি নয়। তাই তারা যেকোনো মূল্যে মুসলমানদের নাম-নিশানা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চায়। নানাভাবে মদিনার মুসলমানদের তারা উত্ত্যক্ত করতে থাকে। অবশেষে বদর প্রান্তরে সূচিত হয় ইসলামের প্রথম বিজয় অভিযান।

বদর যুদ্ধের আগে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য মদিনার নতুন নেতা রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ৬০ জনের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ

করেন হজরত উবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ওপর। অথচ সে বাহিনীতে হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো বিখ্যাত বীর সাহাবিও ছিলেন। তাকে রেখে তবু তিনি এই বৃদ্ধ বীরের কাঁধেই তুলে দেন বাহিনীর ভার। এ অভিযানটি 'সারিয়ায়ে উবায়দা' নামে পরিচিত।

***

যুদ্ধের দিন। মাত্র ৩১৩ জন সাহাবাকে নিয়ে রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রচনা করলেন ইতিহাসের এক শাশ্বত লড়াই। একদিকে মক্কার কাফেররা আধুনিক সমরাস্ত্র আর এক হাজার যোদ্ধার বাহিনী নিয়ে ব্যূহ রচনা করেছে; অন্যদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাত্র স্বল্পসংখ্যক ক্ষুধার্ত মুসলমানকে নিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যাদের যুদ্ধের সওয়ারি নেই, প্রয়োজনমতো ঢাল-তলোয়ার, বর্ম-শিরস্ত্রাণ নেই। তবুও তারা বিজয়ের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বদর প্রান্তরে মুখোমুখি দুই বাহিনী। নিজেদের বাহাদুরি প্রকাশ করার জন্য প্রথমেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালো মক্কার কুরাইশরা। কুরাইশবাহিনী থেকে এগিয়ে এলো আরবের প্রসিদ্ধ তিন বাহাদুর–উতবা, শায়বা ও ওলিদ। মুসলিমবাহিনী থেকে বীরদর্পে এগিয়ে এলেন শেরে খোদা হজরত আলি, রাসুলপিতৃব্য হজরত হামজা এবং বীরকেশরী হজরত আবু মুআবিয়া উরফে আবু উবায়দা ইবনে হারিস মাতলুবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

হজরত আবু মুআবিয়া উরফে উবায়দা ইবনে হারিস মাতলুবি রাদিয়াল্লাহু আনহু শায়বার দিকে এগিয়ে গেলেন। অপর দুই যোদ্ধা এগিয়ে গেলেন উতবা ও ওলিদের দিকে। কোষমুক্ত তরবারি বদর প্রান্তরের আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। শুরু হলো তরবারির ঝনঝনানি। হজরত আলি এবং হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু উতবা এবং ওলিদকে দাঁড়াতেই দিলেন না ময়দানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনকে নরকে পাঠিয়ে দিলেন।

ওদিকে শায়বার সঙ্গে উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন লড়ছিলেন মরণপণ লড়াই। দুজনই জখম হয়েছেন, দরদর করে রক্ত ঝরছে দুজনের শরীরের ক্ষতস্থান থেকে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। দুর্বল শরীর নিয়ে পড়ে গেলেন।

শায়বার শক্তিও শেষ হয়ে এসেছিলো। উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মরণ আঘাত করার জন্য তলোয়ার উত্তোলন করলো সে। সে তলোয়ার উঁচু করতেই অপর দুই মুসলিমযোদ্ধা এগিয়ে এসে তার ভাবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

হজরত উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আঘাত মারাত্মক। শরীরের বিভিন্ন স্থানে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। দুই সতীর্থ হজরত আলি ও হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে ময়দান থেকে উদ্ধার করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পাশে নিয়ে এলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার আঘাতের অবস্থা দেখে ব্যথায় কেঁদে উঠলেন। তিনি হজরত উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে দরদমাখা কণ্ঠে সান্ত না দিলেন।

কিন্তু শাহাদাতের তীব্র বাসনা যার অন্তরে, তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান না করা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছেন না। যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাতলাভের আশায় হজরত উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ব্যাকুল। তিনি মিনতিঝরা কণ্ঠে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন–

'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কপালে কি শাহাদাতের সৌভাগ্য জুটবে না? শহিদের কাতারে কি আমার নাম লেখা হবে না?'

উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অশ্রু সংবরণ করে বললেন–

'অবশ্যই তোমার কপালে এই সৌভাগ্য জুটবে এবং তুমি এই নেয়ামত পেয়ে ধন্য হবে। শুধু তা-ই নয়, তুমি হবে নেককারদের রাহবার।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুখে শাহাদাতের খোশখবরি শুনে হজরত উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি আহত থাকা সত্ত্বেও মুখে হাসি টেনে বললেন–

'আবু তালিব যদি আজ আমাকে এ অবস্থায় দেখতো তবে সে বুঝতো, যে কথা সে বলেছিলো, তার হকদার আমিই...। আবু তালিব বলেছিলো, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করবো, তার জন্য জীবন দেবো এবং নিজেদের পরিবারজন থেকেও তাকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবো।'

হজরত উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই কাঙ্ক্ষিত ওয়াদা আজ নিজের জীবন দিয়ে পূরণ করে যাচ্ছেন।

যুদ্ধ শেষ হলো। সত্তর জনের লাশ ফেলে মক্কার কুরাইশরা রণেভঙ্গ দিয়ে মক্কার দিকে পালিয়ে গেলো। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সূচিত হলো বিজয়ের নাকারায়। শুরু হলো এক নতুন ইতিহাসের।

বদর প্রান্তরের মহাবিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী মদিনার দিকে রওনা হলো। পথিমধ্যেই আহত সেনানী হজরত উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলো। বাহিনী যখন মদিনার কাছাকাছি সাফরা উপত্যকায় আসে, ঠিক তখনই এ সাহাবির প্রাণপাখি বেহেশতের সবুজ বনানীর উদ্দেশে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে ইসলামের এ মহান বীর মুজাহিদকে সাফরা উপত্যকায়ই দাফন করা হয়। তাকে বুকে ধারণ করার কারণেই সাফরা উপত্যকার বুক হতে দীর্ঘদিন এমন বেহেশতি খোশবু পাওয়া যায়।

ইস্পাহানের সাহাবা

আমি

আমি পারস্যের মাহবা ইবনে বুজখশান।
জন্মেছিলাম ইস্পাহানের শহরতলি জাই গ্রামে।
বাবা ছিলেন গ্রামের সরদার। প্রভাবশালী ব্যক্তি। ধর্মের পুরোহিত।
আগুনের উপাসক ছিলেন তিনি। পারস্যের আর সবাই যেমন ছিলো।
আমাকে ভালোবাসতেন খুব।
অন্তরের বাসনা ছিলো– আমাকে বানাবেন ধর্মের পুরোহিত।
আমরা ছিলাম অগ্নিপূজক। আগুনের পূজা করতাম। অগ্নিশ্বর।

আমাদের বাড়িটি ছিলো বিশাল। পিতার বিত্ত-বৈভবের কমতি ছিলো না মোটেও। পিতা আমার জন্য আমাদের বাড়িতেই একটি মন্দির গড়ে দিলেন। অগ্নিশ্বরের মন্দির। সারাক্ষণ মন্দিরের বেদিতে প্রজ্বলিত রাখতে হতো আগুন। আগুনের উপাসনায় নিমগ্ন থাকতাম দিন-রাত। আগুন আমার উপাস্য। আগুন আমার পূজ্য। আগুন আমার ঈশ্বর।

ছোটবেলা থেকেই আগুনের পূজায় কেটেছে আমার অহর্নিশ। আগুনের সঙ্গে আমার সখ্য বেশ গাঢ়। দীর্ঘদিনের সাধনায় আমি দেখেছি আগুনের নানা রূপ। আগুনের নানা রঙের সঙ্গে হয়েছে আমার পরিচয়।

আমার বাবা আমাকে বাড়ির বাইরে খুব একটা যেতে দিতেন না। যদিও বাড়ির বাইরে যেতাম দু-একদিন, আমাদের গ্রামটির বাইরে কখনো পা রাখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। আমার কাছে আমাদের 'জাই'

গ্রামটিই ছিলো আমার পৃথিবী। আমার আহ্নিক ও বার্ষিক গতির একমাত্র কক্ষপথ ছিলো কেবল আমাদের মন্দিরটি। আমাদের মন্দিরে প্রজ্বলিত অগ্নিশ্বরই ছিলো আমার সে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু।

এক নতুন পৃথিবী

আমার বাবা।
সম্মানিত। বিত্তবান। ধর্মীয় পুরোহিত।
তিনি এ অঞ্চলের প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি।
সম্পদ এবং ধর্ম– দু' বিষয়েই তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ববান।
এলাকার লোকজন সম্মান করতেন তাকে।

আমাদের গ্রাম ছাড়াও আশপাশের আরো কয়েকটি এলাকায় আমার বাবার ভূ-সম্পত্তি ছিলো। কোথাও ফসলের চাষ হতো, কোথাও ছিলো ভেড়ার খামার, কোথাও-বা নাশপাতি বাগান।

আমি তখন কেবল কৈশোর পেরোনো সদ্যতরুণ। আমি বড় হয়েছি– এটা বোঝানোর জন্য একদিন বাবা আমাকে দু-তিন গ্রাম দূরের এক খামারে পাঠালেন। সেখানে নতুন কিছু ঘর তৈরি হচ্ছিলো, নতুন একটা বাড়ি করার চিন্তাও ছিলো তার মনে। তাই আমাকে দেখতে পাঠালেন পুরো বিষয়টি।

ভেতরে ভেতরে আমি দারুণ উত্তেজিত। এই প্রথম বাবা কোনো বড় কাজ দিয়ে আমাকে গ্রামের বাইরে পাঠাচ্ছেন। ছোট এ জীবনের এতোটা বছর আমি একপ্রকার বন্দী হয়েই কাটিয়েছি। বাবা অনেক ভয় পেতেন আমাকে নিয়ে, অন্য কোনো ধর্মের আঁচ যদি লেগে যায় আমার মনে, এ কারণে। কিন্তু আমিও মানুষ, আমারও পৃথিবীটা দেখার সাধ আছে, মানুষের সঙ্গে মেশার বাসনা আছে! তাই আজ যখন সুযোগ পেয়েছি, মন ভেতরে ভেতরে গুনগুন করে আনন্দের গান গেয়ে চলেছে। সকাল সকাল তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ঘোড়া চলছিলো দুলকি চালে। আমি চারদিকের পৃথিবী দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কী

রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন! চারদিকে সবুজ গাছপালা, পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডাকছে পাখি। আমি দু' নয়নভরে প্রকৃতির স্বয়ম্ভর রূপবিভা দেখে দেখে চলছি।

রাস্তার পাশে কিছু লোক দেখলাম।

অন্য রকম।

তাদের বেশভূষা আলাদা। তাদের চালচলন আলাদা।

রাস্তার পাশে তাদের একটা উপাসনালয় দেখলাম।

সেখানে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে।

তাদের দেখে আমার কৌতূহল হলো। আমি এগিয়ে গেলাম।

প্রবেশ করলাম তাদের উপাসনালয়ে।

উপাসনালয়ের ভেতরে তারা উপাসনা করছে। তাদের উপাসনা অন্য রকম। আমাদের মতো নয়। আমাদের মতো তারা আগুনের উপাসনা করছে না। তারা অদৃশ্য কিছুর দিকে তাদের মাথা নত করছে। তাঁর সমীপে প্রার্থনা করছে। তাদের সামনে আমি কোনো দৃশ্যমান উপাস্য দেখলাম না। আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেলো। তাদের উপাসনা আমাকে সম্মোহিত করলো। অভিভূত হলাম।

আমি এগিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম– 'এখানে কী হচ্ছে?'

'প্রার্থনা।' জবাব দিলো সে।

'কিসের প্রার্থনা?'

'ঈশ্বরের প্রার্থনা, আবার কার!'

'কিন্তু এখানে তো কোনো মূর্তি বা উপাস্য দেখছি না। তোমাদের ঈশ্বর কে? কার উপাসনা করো তোমরা? তোমাদের ধর্মের নামই বা কী?'

'আমরা খৃস্টান। আমরা একেশ্বরের উপাসনা করি। তাঁর কোনো মূর্তি নেই। তিনি নিরাকার। তিনি অধিষ্ঠিত আছেন সপ্তাকাশের উপরে। কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারে না, তিনি সবাইকে অদৃশ্যভাবে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি সকল ক্ষমতার উৎস। এ বিশ্ব-সৃষ্টিজগৎ তিনিই সৃজন করেছেন। তিনিই নির্মাণ করেছেন আকাশ ও জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, সকল প্রাণী ও জড়। তার ইশারায় সূর্য ওঠে, বৃষ্টি হয়, জমিনে ফসল

ফলে, নদী বয়ে চলে, পাখি গান গায়... সকল সৃষ্টির স্রষ্টা তিনিই। তিনিই পরিচালনা করেন সকল সৃষ্টি।'

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে লোকটির কথা শুনছিলাম। আমি আমার কর্তব্যের কথা ভুলে গেলাম। বাবার খামার দেখার কথা ভুলে আমি সেই উপাসনালয়ে রয়ে গেলাম। সেখানকার পুরোহিতদের কাছে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম খৃস্টান ধর্ম বিষয়ে।

'এ খৃস্টান ধর্মের উৎপত্তি কোথায়?'

'শাম– সিরিয়ার জেরুসালেমে।'

'কোথা থেকে পেলেন আপনারা এ ধর্ম?'

'ঈসা মসিহ আমাদের নবি ছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের পুত্রবৎ। তিনিই আমাদের জন্য এ ধর্ম নিয়ে আসেন। তার মায়ের নাম মেরি, তিনি স্বামীহীন হয়েও ঈশ্বরের কুদরতে ঈসা মসিহকে গর্ভধারণ করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই নিয়ে আসেন এ পৃথিবীতে।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম পুরোহিতের কথা।

আমি টের পাচ্ছিলাম আমার ভেতরে পরিবর্তনের হাহাকার।

স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম আমার বিশ্বাস ভাঙার মড়মড় শব্দ।

আমার অন্তরে নির্মিত আগুনের বিধাতা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছিলো নিমিষে।

আমার চোখের সামনে খুলে যাচ্ছিলো একটার পর একটা আলোক-দরজা।

আমার অন্তঃকরণে স্থাপিত হচ্ছিলো এক মহাসত্যের আকাশচুম্বী সৌধ।

বন্দী পাখি

কখন যে সারা দিন গিয়ে বিকেল হয়ে গেছে, সেদিকে আমার খেয়ালই নেই। সন্ধ্যা হতে হতে আমি বাড়ির পথ ধরলাম।

বাড়ি ফিরেই শুনলাম, বাবা আমাকে খামারে না পেয়ে আমাকে খোঁজার জন্য এদিক-ওদিক লোক পাঠিয়েছেন। ঘরে উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছেন।

আমি বাবার কাছে যেতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বেটা আমার, কোথায় ছিলে তুমি এতোক্ষণ?'

আমি সরলমনে বলতে লাগলাম, 'বাবা, খামারে যাওয়ার পথে আজকে আমার একদল লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাদের ভিন্ন ধরনের উপাসনা দেখে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলি। তারা একেশ্বরবাদের উপাসনা করে। তারা আগুনের পূজা করে না। আমি তাদের গির্জায় গিয়েছিলাম। তাদের উপাসনা, তাদের প্রার্থনা, তাদের ধর্মের অনেক রীতিনীতি আমি দেখে এসেছি। তাদের ধর্মের ইতিহাস, ধর্মের নবি ও কিতাব সম্বন্ধে আমি জেনে এসেছি। তাদের ধর্মটা আমার অনেক ভালো লেগেছে। এ কারণে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি তাদের কাছেই ছিলাম। তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে কাটাতে খামারে যাওয়ার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

আমার পিতা আমার কথা শুনে আতঙ্কিত বোধ করলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'বেটা, তুমি যাদের কথা বলছো তাদের ধর্মের চেয়ে আমাদের ধর্ম অনেক উত্তম। তাদের ধর্মে কোনো মঙ্গল নেই। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম বাদ দিয়ে নতুন এক ধর্মের প্রবর্তন করেছে। যারা তাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বই দেখাতে পারে না কাউকে, তাদের ধর্ম কীভাবে সঠিক হতে পারে, বলো?'

আমি আমার বাবাকে আগুন ও জড়বস্তুর অসারতা বুঝিয়ে বললাম, 'না বাবা, অবশ্যই তাদের ধর্ম আমাদের বস্তুপূজার ধর্মের চেয়ে উত্তম। তাদের উপাসনা আমাদের উপাসনা থেকে অভিনব। তাদের প্রার্থনা আমাদের প্রার্থনার চেয়ে মুগ্ধকর ও বিনীত। ঈশ্বরের কসম! আমার কাছে তাদের ধর্মকেই সত্য ও মঙ্গলময় মনে হয়েছে।'

এবার আমার বাবা প্রমাদ গুনলেন। খৃস্টান ধর্মের প্রতি আমার আসক্তি লক্ষ করে তিনি আমাকে নানাভাবে ওই ধর্মের অসারতা বোঝাতে লাগলেন। কিছুতেই কিছু হলো না। আমার বিশ্বাসী মন সর্বদা যে একক ঈশ্বরের খোঁজ করতো, যে সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে আমি সব সময় অস্থিরতা অনুভব করতাম– এ ধর্মের মধ্যে আমি যেন সে অনুসন্ধানেরই প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলাম।

আমার দৃঢ়তা দেখে আমার বাবা এবার আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করলেন। আমাকে শাসাতে লাগলেন। যদি আমার মনের মধ্য থেকে ওই ধর্মের আসক্তি দূর না করি, তবে আমাকে বন্দী করে রাখবেন বলেও হুমকি দিলেন।

আমি তবু অনড়। অবশেষে বাধ্য হয়েই আমার ধার্মিক বাবা আমাকে বন্দী করে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। একজন অগ্নিপূজক যাজক হয়ে তার ছেলে খৃস্টান হয়ে যাবে–এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

তিনি আমার পায়ে শেকল পরালেন। আমাকে বন্দী করলেন এক নির্জন ঘরে। যে ঘরে কেবল একটিমাত্র জানালা। জানালা দিয়ে একটুখানি আলো আসে। ঘরের দরজা সব সময় বন্ধ থাকে। খাবার দেবার প্রয়োজন হলে একজন চাকর এসে খাবার দিয়ে যায়।

এই চাকরটি আমাকে খুব ভালোবাসতো। আমার এমন দুরবস্থা দেখে সে ভীষণ কাঁদতো। আমি তাকে অভয় দিতাম– যে সত্যিকারের ঈশ্বরের জন্য আজ আমার পায়ে শেকল পড়েছে, একদিন সে ঈশ্বরই আমাকে এখান থেকে মুক্ত করবেন।

আমার ভেতরে তখনো খৃস্টধর্মের প্রতি মমত্ববোধ মোটেও কমেনি। সেদিন গির্জায় আমি যখন নবি ঈসা মসিহের কথা শুনলাম, তখনই আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো আমি ঈশ্বরের তালাশে সিরিয়ায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে খৃস্টধর্মের পাদ্রিদের সংস্পর্শে ওই ধর্মের যাবতীয় উপাসনা-অর্চনা শিখে আসি। কিন্তু আমার পায়ে শেকল পরানো, আমি কীভাবে যাবো দূর সিরিয়ায়?

যে চাকরটি আমাকে খাবার দিয়ে যেতো, তাকেও আমি এ ধর্মের বিশদ বললাম। তার অন্তর দ্রবীভূত হলো। একদিন তাকে বললাম, 'তুমি আমার জন্য একটা কাজ করতে পারো। আমি গ্রামের পাশে খৃস্টানদের যে গির্জায় গিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে তুমি গির্জার পাদ্রিকে আমার কথা বলবে। তাকে আরো বলবে, এ অঞ্চলে যখন সিরিয়া থেকে কোনো খৃস্টান ব্যবসায়ী কাফেলা আসে, তখন যেন আমাকে সংবাদ দেয়।'

আমার কথামতো চাকরটি গির্জায় গিয়ে প্রধান পুরোহিতকে আমার সংবাদ এবং নির্দেশনা জানিয়ে এলো। এবার আমার দিন গোনার পালা। আমি অধীর অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগলাম– কবে আসবে সিরিয়ার কাফেলা, যাদের সঙ্গে আমি সিরিয়া যেতে পারবো।

বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। কয়েক দিন বাদেই ওই খৃস্টান গির্জা থেকে আমাদের চাকরের কাছে সংবাদ পাঠানো হলো– সিরিয়া থেকে একটি খৃস্টান ব্যবসায়ীদল এসেছে। তারা এখানে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে এসেছে। পণ্য বিক্রি করে আবার কয়েক দিনের মধ্যেই চলে যাবে।

চাকর যখন আমাকে এ সংবাদ জানালো, তখন আনন্দে আমার মনটা নেচে উঠলো। আমি জলদি তাকে বললাম, 'তুমি ওই পুরোহিতকে গিয়ে বলো, ব্যবসায়ীদল যেদিন ইস্পাহান ছেড়ে চলে যাবে, সেদিন যেন আমাকে জানায়।'

চাকরটি আমার কথা জানালো পুরোহিতকে।

সপ্তাহখানেক পর এক সন্ধেবেলা। আমাদের চাকরটি এসে জানালো, আজ রাতেই খৃস্টান ব্যবসায়ীদলটি এ এলাকা ছেড়ে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করবে।

এ সংবাদ শুনে আমি আমার সিদ্ধান্ত আরেকবার ভেবে দেখলাম। না, আমি কোনো ভুল করছি না। এতোদিন আমি যে আগুনের পূজা করেছি, তা ভ্রান্ত, ভুল। আগুনের কোনো ঐশ্বরিক শক্তি নেই। শক্তি নেই কোনো মূর্তি বা ভাস্কর্যের। পৃথিবীর কোনো জড় বা জীবের কোনো শক্তি নেই। সকল শক্তির আরাধ্য কেবল একক ঈশ্বর। আমি তার খোঁজেই আজ ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

আমি আমাদের সেই চাকরটির সাহায্যে নিজের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেলাম। সন্ধ্যা একটু ঘনিয়ে আসতেই রাতের আঁধারে চুপিসারে বাড়ি থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে আসতেই মনে হলো আমি যেন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি। আবার খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াতে পেরে মনটা ফুরফুরে হয়ে গেলো।

সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই হাতে। আমাদের চাকরটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে পা বাড়ালাম সেই কাঙ্ক্ষিত গির্জাটির দিকে। সেখানে গিয়ে পুরোহিতকে নিয়ে পৌঁছালাম সিরিয়ার ব্যবসায়ীদলটির কাছে। তারা রওনা হওয়ার জন্য তৈরি আছে। আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলো। পুরোহিত আগে থেকেই তাদেরকে আমার ব্যাপারে বলে রেখেছিলেন। আমি আসতেই আর দেরি না করে রওনা হয়ে গেলো কাফেলা। গির্জার পুরোহিত আমার সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করে আমাকে বিদায় দিলেন– ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!

সিরিয়ায় মুসাফির

সত্য ধর্ম। নতুন ধর্ম।
নতুন এক পৃথিবী।
নতুন এক সফর।
আমি পাড়ি দিয়ে এলাম পারস্য।
পেছনে ফেলে এলাম ব্যাবিলন। অসংখ্য শহর নগর গ্রাম জনপদ।
হাজারো মানুষ, অসংখ্য বাড়িঘর ছুঁয়ে এলাম।
অগণিত পথে রেখে এলাম নিজের পায়ের ছাপ।
পাহাড় নদী মরু বনভূমি পেরিয়ে এলাম।
দীর্ঘ সফর শেষে একদিন এসে পৌঁছালাম পুণ্যভূমি সিরিয়ায়।
জেরুসালেম।

এ জেরুসালেমেই একদিন একেশ্বরের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন নবি ঈসা। তিনি মানুষকে অন্যান্য ধর্ম থেকে বিরত হয়ে কেবল একেশ্বরের উপাসনার ডাক দেন। কিন্তু ইহুদি ও পৌত্তলিকরা তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকে হত্যা করে শূলিতে চড়িয়ে। কিন্তু তবু তার আনীত ধর্ম লীন হয়ে যায়নি। পৃথিবীতে এখনো চলছে সে একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রচার ও প্রসার।

এখানে এসে আমি ব্যবসায়ী কাফেলার সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে

জিজ্ঞেস করলাম, 'খৃস্টধর্মের ব্যাপারে আমাকে সম্যক দীক্ষা দিতে পারবে– এমন ব্যক্তি এখানে কে আছেন?'

তিনি বললেন, 'তাহলে এখানকার বড় গির্জার পাদ্রির কাছে যাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো হবে। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও সাধক ব্যক্তি। তুমি তার কাছেই যাও।'

আমি ওই ব্যক্তির কথানুযায়ী গির্জায় গেলাম। গির্জার পাদ্রির কাছে গিয়ে আমার মনের অভিব্যক্তি খুলে বললাম। সত্য ধর্মের সন্ধানে আমার আকুলতা তার কাছে ব্যক্ত করলাম– 'আমি এ খৃস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। এ ধর্মে দীক্ষিত হতে চাই। আমাকে দীক্ষা দিন সে সত্যের যে সত্যের বার্তা বহন করেছে আকাশের ফেরেশতারা। আমাকে দেখান সে আলোর মিছিল, যে মিছিলে মিশে আছে পূর্ববর্তী মানুষের পুণ্যপথ। আমাকে এ গির্জার একজন শিক্ষানবিশ করে নিন। শিক্ষা দিন খৃস্টধর্মের সকল আচার-উপাসনা।'

পাদ্রি আমার হৃদয়ের আকুতি দেখে আমাকে নিয়ে গির্জার ভেতরে গেলেন। আমাকে দীক্ষিত করলেন খৃস্টধর্মে। একজন শিক্ষানবিশ হিসেবে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন গির্জার আচার-অনুষ্ঠানে।

কিছুদিন কাটলো গির্জায়। ধর্মীয় বিষয়াদি শেখার জন্য আমি প্রধান পাদ্রির কাছাকাছি থাকতাম সব সময়। কিন্তু এ কাছাকাছি থাকতে গিয়ে আমি পাদ্রির অত্যন্ত অসাধু কিছু কার্যকলাপ জেনে গেলাম। এমন একজন মহান মানুষের দ্বারা যে এমন কাজ হতে পারে, তা আমি ভাবতেই পারিনি।

গির্জার প্রধান পাদ্রি হিসেবে এলাকার সকল খৃস্টান তাদের দান বা খয়রাতের টাকা পাদ্রির হাতে দিয়ে যেতো। তিনি নিজেও এলাকায় এলাকায় গিয়ে ঈশ্বরের ধর্মপুত্রদের (পাদ্রি) সাহায্য করার ওয়াজ করে মানুষের কাছ থেকে অনেক দিনার-আশরফি নিয়ে আসতেন।

এভাবে গির্জার জন্য খৃস্টানরা যা কিছু দান করেছে এ যাবৎ, তিনি তার কিছুই গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেননি। বরং সকল সম্পদ ও

অর্থকড়ি তিনি নিজে কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। এভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করতে করতে তিনি সাতটি কলস স্বর্ণ দিয়ে ভরে ফেলেছিলেন।

একদিন আমি এসবের উৎস জেনে ফেলি এবং এজন্য প্রধান পাদ্রির প্রতি ক্রুদ্ধ হই। মনের মধ্যে এতোদিন যাকে মহাত্মার আসন দিয়েছি, তার এমন আচরণে মুহূর্তে সে আসন ধুলোয় মিশে যায়। তাকে একজন ভণ্ড ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিলো না।

সৃষ্টিকর্তার করুণাই বলতে হবে, এ ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরই ওই পাদ্রি হঠাৎ করে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

খৃস্টানরা তার মৃত্যুতে অনেক শোক করলো। অনেক ব্যথিত হলো প্রধান পাদ্রির এমন অকস্মাৎ মৃত্যুতে। তারা তার দাফনের ব্যবস্থা করতে লাগলো। কিন্তু এই ভণ্ড লোকটির জন্য সাধারণ মানুষের শোক আমাকে ব্যথিত করলো। একজন সম্পদলোভী ধর্মব্যবসায়ীর জন্য কেন তারা ব্যথিত হবে? সে তো ছিলো স্রেফ একটা ধোঁকাবাজ।

যখন সকল লোক তার দাফনে সমবেত হলো, তখন আমি উচ্চস্বরে বলতে লাগলাম, 'গির্জার সম্মানিত সমাধিস্থলে তোমরা কাকে দাফন করছো? যে ব্যক্তি একজন ধোঁকাবাজ ছিলো, একজন সম্পদ আত্মসাৎকারী ছিলো তাকে তোমরা এতো সম্মানের সঙ্গে দাফন করতে যাচ্ছো? সে তো একটা সম্পদলোভী ধর্মব্যবসায়ী ছিলো।'

তারা আমার কথায় আশ্চর্য হয়ে বললো, 'তুমি যা বলছো তার কী প্রমাণ আছে তোমার কাছে?'

আমি বললাম, 'তোমরা গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার জন্য যে অর্থ-সম্পদ এ পর্যন্ত তার হাতে সঁপে দিয়েছো, তার এক দিরহামও তিনি কাউকে দান করেননি। সমস্ত অর্থ তিনি নিজে কুক্ষিগত করে রেখে দিয়েছিলেন।'

তারা এ কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলো। কিছু মানুষ তৎক্ষণাৎ সে সম্পদের ব্যাপারে জানতে চাইলো। আমি তাদের নিয়ে গির্জার নির্দিষ্ট

স্থানে রক্ষিত সকল ধন-সম্পদ দেখিয়ে দিলাম। সেখানে সাত কলস পূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্য সাজানো ছিলো। এছাড়া আরো অন্যান্য সম্পদেরও খোঁজ পাওয়া গেলো।

এসব দেখে এলাকার গণ্যমান্য লোকজন সিদ্ধান্ত নিলো, তারা এ ভণ্ড পাদ্রিকে দাফন করবে না। বরং মৃত পাদ্রিকেই শূলে চড়াবে। যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজ। কয়েকজন গিয়ে মৃত পাদ্রিকে ধরে শূলিতে চড়িয়ে দিলো এবং ঘৃণায় তার মৃতদেহের দিকেই পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো।

দেশ থেকে দেশান্তরে

এ ঘটনার পর জেরুসালেমের অবস্থা বেশ কয়েক দিন থমথমে হয়ে রইলো। তবে বেশি দিন স্থায়ী হলো না স্থবির অবস্থা। সপ্তাহখানেক পরই নতুন এক পাদ্রি নিয়োগ দেয়া হলো গির্জার জন্য।

তিনি আসতেই আমি তাকে দেখতে গেলাম। তিনি বৃদ্ধ একজন লোক। চুল-দাড়ি অধিকাংশই পেকে গেছে। তবে তার চেহারায় আলাদা এক ধরনের জ্যোতি আছে, দেখলেই মনের মধ্যে সমীহ জেগে ওঠে। তাকে একনজর দেখেই মনে হলো– ইনিই সেই লোক, যাকে আমি খুঁজছি।

কিছুদিন যেতেই আমি বুঝতে পারলাম, আমার ধারণা মোটেও অমূলক নয়। তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন সাধক ব্যক্তি। জ্ঞান ও ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রাজ্ঞতায় তার সমকক্ষ আমি আর কাউকে দেখিনি। দুনিয়ার মধ্যে আমি এরূপ দুনিয়াত্যাগী, পরকালের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী এবং দিন-রাত উপাসনাকারী মানুষের সন্ধান পাইনি আর। তার সান্নিধ্যে যখনই যেতাম, মনে হতো কোনো স্বর্গীয় ঝরনার পাশে বসে আছি। তার কথাগুলো ছিলো গুরুগম্ভীর কিন্তু মার্জিত। কিছুদিন তার সংস্পর্শে থাকার পর আমার মনে হলো, ইতিপূর্বে আমি অন্তর থেকে তার চেয়ে বেশি আর কাউকে ভালোবাসিনি।

তার সান্নিধ্যে আমি দীর্ঘদিন অবস্থান করলাম। শিখতে পারলাম অনেক কিছু। অনেক বিদ্যা ও জ্ঞানের দীক্ষা তিনি আমাকে দিলেন। আমি ছিলাম তার একনিষ্ঠ অনুরক্ত।

তিনি এমনিতেই অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর ডাক একদিন তাকেও আহ্বান করলো। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন আমি তার শিয়রের পাশে গিয়ে বললাম, 'হে মহাত্মন! আমি আপনার সাথে ছিলাম এবং আপনাকে যেভাবে অন্তর থেকে ভালোবেসেছি, এর আগে এভাবে আর কাউকে ভালোবাসতে পারিনি। আপনার কাছ থেকে যে জ্ঞান আমি আহরণ করেছি, তার তুল্য কিছু নেই। কিন্তু হায়! আপনার নিকট ঈশ্বরের যে আদেশ পৌঁছেছে তা আপনি প্রত্যক্ষ করছেন। এখন কার প্রতি আপনি আমাকে সোপর্দ করছেন? আপনার অবর্তমানে আমি কার কাছে গিয়ে আমার জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করবো? কীভাবে আমি ঈশ্বরের আরাধনা করবো?'

এ কথাগুলো বলে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। বৃদ্ধ পাদ্রি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বৎস! সময় অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তোমার মতো একদিন আমিও ঈশ্বরের খোঁজে পথে নেমেছিলাম। কতোটুকু তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি জানি না। তবে আমি যা অর্জন করেছি, যতোটুকু ধর্মের সঠিক পথের ওপর থাকার চেষ্টা করেছি; এখন আমি আমার পথের ওপর আর কাউকে দেখি না। মানুষজন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ধর্ম অনেক পরিবর্তন করেছে। ধর্মের মধ্যে অনেক নতুন প্রথা ও রেওয়াজ চালু করেছে। তারা তাদের অনুসৃত ধর্মাচরণের অধিকাংশই ত্যাগ করেছে।'

কথাগুলো বলতে বলতে বৃদ্ধ পুরোহিত খানিকটা হাঁপিয়ে উঠলেন। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, 'তবে আমার তিরোধানের পর তুমি যদি চাও তোমার ধর্মানুসন্ধানের সাধনা জারি রাখবে, তাহলে তুমি ইরাকের মসুলে চলে যেও। সেখানে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি এখনো আমার পথে আছেন। এখনো তিনি আমার মতোই নিজ ধর্মে অটল আছেন। ধর্মবিশ্বাসকে অপধার্মিকতার হাত থেকে মুক্ত রেখেছেন। পারলে তুমি তার সাথে মিলিত হয়ো।'

এ ঘটনার দুদিন পরই এ মহাত্মন পুরোহিত মৃত্যুবরণ করেন।

তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, আমি যেন আবার নিঃস্ব হয়ে গেছি। একাকিত্ব আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলো। এ একাকিত্ব থেকে মুক্তি পেতে আবার পথে নামলাম।

জেরুসালেমে বেশ কয়েক বছর থাকার দরুন আমি নিজেও কিছু সম্পদ আহরণ করেছিলাম। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার সময় সঙ্গে করে মূল্যবান কিছু জিনিস নিয়ে এসেছিলাম। তাছাড়া এখানে দীর্ঘদিন ধরে বাস করছি বিধায় নিজেও কিছু কাজ করতাম। এসব করে আমার যা সম্পদ অর্জিত হয়েছিলো, তা দিয়ে কিছু গরু ও বকরি কিনেছিলাম। পথে নামার সময় সেগুলোও সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

এবারের গন্তব্য ইরাকের মসুল নগরী।

পথ থেকে পথে

জেরুসালেম থেকে মসুল। গুরুর সান্নিধ্য পেতে।
মসুলে এলাম। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে।
তাকে পেলাম। বললাম নিজের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা।
তিনি আমাকে নিরাশ করেননি। তিনি ছিলেন উত্তম মানুষ।
ধর্ম ও বিশ্বাস ছিলো তার অটল। তিনি একেশ্বরবাদী।
একদিন তিনিও মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন।
আমি শঙ্কা নিয়ে তার কাছে গেলাম। এরপর আমার গন্তব্য?
তিনি বললেন– তোমার গন্তব্য এবার নাসিবিন।
আছেন একজন এখনো। সকল ধর্মীয় অনাচার থেকে মুক্ত।
যাও, সেখানে চলে যাও।
তিনি ঈশ্বরের ডাকে চলে গেলেন।
তাকে সমাধিস্থ করা হলো।

আমি এলাম নাসিবিনে। পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে।
ধর্ম বিষয়ে আমার দুর্দমনীয় স্পৃহা আমাকে নিয়ে এলো।

আমি গেলাম নাসিবিনের গুরুজির কাছে।
তিনি ছিলেন সৎ। ধর্মবিষয়ে নিষ্ঠাবান।
ধর্মের নব্য পালাবদল তাকে টলাতে পারেনি।
তিনি আমার দীক্ষার ভার নিলেন। আমাকে শিষ্য করে নিলেন।
আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন উপাসনার প্রজ্ঞার সাথে।
তার সান্নিধ্য আমাকে তৃপ্ত করলো।
তার সাহচর্য আমাকে বিনীত করলো।
আমি ঈশ্বরের প্রেমে আরো গভীরভাবে লীন হতে চাইলাম।
কিন্তু ঈশ্বর চাইলেন অন্য কিছু।
আমার গুরু এ সৎলোকটির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো।
আমি আমার পরবর্তী নির্দেশনা জানতে চাইলাম।
তিনি বললেন– চলে যাও আম্মুরিয়্যাহ।
একজন আছেন, এখনো যিনি দৃঢ় আছেন সঠিক পথে।
আঁকড়ে আছেন খৃস্টধর্মের প্রোথিত শেকড়।
কয়েক দিন পরই তিনি পরপারে চলে গেলেন।

আমার গন্তব্য আম্মুরিয়্যাহ। আম্মুরিয়্যাহর নতুন এক সাধক।
উপস্থিত হলাম তার সমীপে।
প্রকাশ করলাম আমার হৃদয়ের অভিন্ন সুর।
কীভাবে আমি একজন একজন করে তালাশ করে যাচ্ছি সত্য ধর্ম।
একের পর এক সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।
আমাকে পথ দেখান হে মহাজন!
তিনি শুনলেন আমার হৃদয়ের আকুতি।
আমাকে বরণ করে নিলেন।

এক সুসংবাদ

আমি আম্মুরিয়্যাহতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করলাম। আমার পালিত গরু ও বকরির পাল বেশ বড় হয়ে গিয়েছিলো ততোদিনে। আম্মুরিয়্যাহর সাধকের উপাসনালয়ের পাশেই নিজের জন্যও আমি একটি

আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছিলাম। সেখানেই আমার এ গরু ও ছাগলের পাল রাখতাম।

সারাদিন আমি সাধকের সান্নিধ্যে পড়ে থাকতাম। ঈশ্বরের আরাধনায় কাটাতাম দিনমান। সাধক আমাকে কেবল ধর্মীয় জ্ঞানই নয়, শিক্ষা দিতেন পৃথিবীর আরো অজানা সব জ্ঞান। তিনি আমাকে বলতেন পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-উপজাতি, ধর্ম ও বিধর্মী বিষয়েও। অনেক বড় পণ্ডিত ছিলেন তিনি।

গির্জায় এভাবেই কাটছিলো আমার আম্মুরিয়্যাহর দিনগুলো। কিন্তু এখানেও আমার সাধকের সান্নিধ্য বেশিদিন স্থায়ী হলো না। বৃদ্ধ সাধক একদিন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন। ঈশ্বরের কাছে যাবার সময় হয়ে এলো তার। আমিও একের পর এক গির্জায় ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এক পুরোহিত থেকে অন্য পুরোহিতের কাছে যেতে যেতে অবসাদ এসে গিয়েছিলো। মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলো- কবে আমি পরিপূর্ণভাবে জানতে পারবো ঈশ্বরের ধর্মের নিগূঢ় আরাধনার সকল বিষয়াবলি?

সাধক মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমি গিয়ে বসলাম তার শিয়রে। নিজের অন্তরের যাতনা তার কাছে খুলে বললাম- 'হে গুরু! আমি প্রথমে ইস্পাহানে এক পাদ্রির নিকট ছিলাম। তিনি আমাকে জেরুসালেমে প্রেরণ করলেন। সেখানে আমি আরেক পাদ্রির তত্ত্বাবধানে ছিলাম। তার মৃত্যুর পর অন্য একজনের করকমলে। তিনি মৃত্যুশয্যায় মসুলের আরেক পাদ্রির ব্যাপারে অসিয়ত করে যান। মসুলে এলাম। মসুলের সাধকের মৃত্যু হলে তার অসিয়ত অনুযায়ী নাসিবিনে এক পাদ্রির নিকট গেলাম। তার সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর যখন তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন অসিয়ত করলেন নাসিবিনের এক পাদ্রির কাছে যেতে। তার মৃত্যুর পর নাসিবিনে এলাম। নাসিবিনের সাধকও একদিন আমাকে ছেড়ে প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আপনার সাহচর্যে আসার অসিয়ত করলেন। তার মৃত্যুর পর আপনার কাছে এলাম। আজ আপনিও মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এভাবে একজন একজন করে আমার সকল ধর্মগুরু চলে যাচ্ছেন অথচ আজও আমি সত্যিকারের ঈশ্বরের

খোঁজ পেলাম না। এখন বলুন, আপনি আমাকে কার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে অসিয়ত করছেন?'

বৃদ্ধ সাধক অতি কষ্টে মুচকি হেসে বললেন, 'হে বৎস! আমার জানামতে এখন আর এমন কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে জীবিত নেই যে আমাদের ধর্মের সঠিক পথের ওপর রয়েছে এবং যার নিকট যাওয়ার জন্য তোমাকে আদেশ করবো। তবে আমি মনে করি, তোমার আর কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। সময় সন্নিকটে। যে শেষ নবির কথা আমাদের জানানো হয়েছে, সে শেষ নবির আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি ইবরাহিম আলায়হিস সালামের ধর্মে প্রেরিত হবেন। আরবভূমিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। আর তিনি এমন ভূমির দিকে হিজরত করবেন, যা পাথরময় হবে এবং সেখানে অনেক খেজুর বৃক্ষ থাকবে। তার কিছু স্পষ্ট নিদর্শন থাকবে। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন, তবে সদকাহ ভক্ষণ করবেন না। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যভাগে থাকবে নবুওতের সিলমোহর। যদি তোমার ওই দেশে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে, তবে তুমি চলে যাও। আমার যদি হায়াত থাকতো, তবে আমিও চলে যেতাম। কিন্তু জীবনের সফর আমার শেষ হওয়ার পথে। আমার জীবদ্দশায় হয়তো তাকে আর দেখতে পাবো না, তার আনীত ধর্মে দীক্ষিত হতে পারবো না। তবে তোমাকে অসিয়ত করে যাচ্ছি, শেষ নবির সান্নিধ্য যদি পাও, তাহলে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যেও।'

এ অসিয়তের কয়েক দিন পরই আম্মুরিয়্যাহর এ সৎসাধক মৃত্যুবরণ করলেন।

নবির জন্য প্রতীক্ষা

আম্মুরিয়্যাহ থেকে আমি আর কোথাও গেলাম না। এখানেই বসবাস করতে লাগলাম। আমি যে গরু ও বকরি পালন করতাম, সেগুলোই দেখাশোনা করতে লাগলাম আর শেষ নবির আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুদিন পর আম্মুরিয়্যাহতে আরবের একটি বাণিজ্য কাফেলার দেখা পেলাম। তারা আরবের কালব গোত্রের অধিবাসী, ব্যবসা শেষে

আরবের দিকে যাচ্ছিলো। তাদের দেখেই আমার মনের মধ্যে আরবে যাওয়ার বাসনা জেগে উঠলো। তাদের কাছে গিয়ে বললাম, 'তোমরা কি আমাকে আরবে নিয়ে যাবে?'

কিন্তু তারা আমার কথায় তেমন একটা পাত্তা দিলো না। তাদের অনীহা দেখে আমি প্রস্তাব দিলাম, 'তোমরা যদি আমাকে আরবে নিয়ে যাও, তবে আমার যতো গরু ও বকরি আছে, সব তোমাদের দিয়ে দেবো।'

এবার লোভে তাদের চোখগুলো চকচক করতে দেখলাম। তারা আমার প্রস্তাবে রাজি হলো। আমি জলদি আম্মুরিয়্যাহর পাট চুকিয়ে কালব গোত্রের সঙ্গে আরবের পানে যাত্রা শুরু করলাম।

কয়েক দিনের সফর শেষে আমরা আরবভূমিতে পৌঁছালাম। এ জায়গাটার নাম ওয়াদি আলকুরা। এখানে এসে কাফেলা কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করলো। আমি তখনো বুঝতে পারিনি ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

সবাই যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলো, তখন কালব গোত্রের আমার সফরসঙ্গীরা হঠাৎই আমার ওপর আক্রমণ করে আমাকে বন্দী করে ফেলে এবং আমাকে দাস হিসেবে দাসবাজারে নিয়ে আসে। ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস মেনে নেয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলো না।

দাসবাজার থেকে এক ইহুদি ব্যক্তি আমাকে কিনে নিয়ে যায়। তার অনেকগুলো খেজুরের বাগান ছিলো, আমাকে সেগুলো দেখাশোনা ও পানি সেচের দায়িত্ব অর্পণ করে। তবে এখানে এসে আমার কেন যেন মনে হতে লাগলো, এ ভূমি তো সম্ভবত সেই ভূমি, যার কথা আম্মুরিয়্যাহর সাধক আমাকে বলে গিয়েছেন। এখানেই তো খেজুরগাছের আধিক্য, সেই পাথরময় শুষ্কভূমি। এখানেই তো একদিন শেষ নবির আগমনের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত করে গেছেন। সুতরাং, কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি সেই নবির ব্যাপারে ইন্তেজার করতে লাগলাম। কখন আসবেন তিনি?

এর মধ্যে আমার ইহুদি মুনিবের এক চাচাতো ভাই তার সঙ্গে একদিন দেখা করতে এলো। সে ছিলো ইহুদি বনু কুরায়জা বংশের লোক। চাচাতো ভাইয়ের কাছে এসে সে আমাকে দেখে বললো, তার কাজের জন্য একজন ক্রীতদাস দরকার। তাই সে আমাকে কিনতে চায়। তার চাচাতো ভাই সানন্দে আমাকে বনু কুরায়জার ওই লোকটির কাছে বিক্রি করে দিলো। বনু কুরায়জার ইহুদি লোকটি আমাকে নিয়ে তার আবাসস্থল মদিনায় চলে এলো।

খোদার কসম! মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছামাত্রই আমি চিনে ফেললাম– এ তো সেই নগরী! এ তো সেই জনপদ, যেখানে একদিন শেষ নবি আসবেন। আমার সাধকগুরু আমাকে যেসব বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এ এলাকা হুবহু মিলে যাচ্ছে। সেই পাথরমরু, বৃক্ষসারি, খেজুরবীথিকা... সব এখানে। খুশিতে আমার মনটা ভরে উঠলো। অবশেষে আমি তবে শেষ নবির সাক্ষাৎ পাচ্ছি!

নিজের আনন্দ নিজের মধ্যেই গোপন করে রাখলাম। কাউকে কিছু না জানিয়ে ইহুদির অধীনে কাজ করে যেতে লাগলাম আর অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন তিনি আসবেন!

একদিন আমার প্রতীক্ষার পালা শেষ হলো। আল্লাহ তাঁর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মদিনা আসার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে মদিনায় এলেন। কিন্তু আমি তাঁর সংবাদ জানতে পারিনি। ক্রীতদাস হওয়ার দরুন আমাকে সব সময় খেজুর বাগানে থাকতে হতো বিধায় আশপাশের খবরাখবর আমি খুব একটা জানতে পারতাম না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন সবেমাত্র মদিনায় তশরিফ এনেছেন। আমার মুনিবের কাছে তার সেই চাচাতো ভাই এলো এবং বলতে লাগলো– 'আল্লাহ বনি কায়লাহদের ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! তারা কুবাতে মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির নিকট সমবেত হয়েছে। তারা তাকে নবি বলে ধারণা করছে। ইয়াসরিবের আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা তার চারপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। যত্তোসব!'

আমি তখন তাদের পাশেই এক খেজুরগাছের ওপর বসে গাছটির পাতা কাটছিলাম। তার কথা শুনে আমার শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেলো। তিনি এসেছেন? শেষ নবি মদিনায় এসেছেন? আমি তাকে দেখতে পাবো? তাঁর কথা শুনতে পাবো? শেষ নবির উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য হবে আমার?

এসব ভাবতে ভাবতে আমার মনে হলো, আমি সম্ভবত গাছ থেকে নিচে পড়ে যাবো। জলদি আমি গাছ থেকে নিচে নেমে এলাম এবং মুনিবের সেই চাচাতো ভাইকে বলতে লাগলাম, 'আপনি কী বলছিলেন? আপনি কী বলছিলেন? আরেকবার দয়া করে বলুন!'

আমার এমন হন্তদন্ত ভাব দেখে আমার মুনিব চটে গেলো এবং আমাকে খুব জোরে আঘাত করলো। ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলো, 'এ ব্যাপারে তোমার কী হয়েছে? আমাদের কথার মধ্যে নাক গলাও কেন? তুমি তোমার কাজে যাও।'

আমি আকুতিভরে বললাম, 'কিছুই না। আমি শুধু তিনি যা বলেছেন, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছি।'

নবি সমীপেষু

আমার নিকট কিছু সম্পদ ছিলো, যা আমি সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। এ সম্পদের কথা কাউকে কখনো বলিনি, নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। যখন সন্ধ্যা হলো, তখন আমি তা নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি তখন ইয়াসরিবের সন্নিকটে কুবাতে অবস্থান করছিলেন। আমি আমার ক্ষুদ্র সম্বলগুলো নিয়ে কুবায় চলে এলাম।

অনেক লোকজন তাকে ঘিরে বসে ছিলো। আমিও সন্তর্পণে তাঁর কাছাকাছি গেলাম। দুরু দুরু বুকে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'আমি জানতে পেরেছি আপনি একজন সৎ ব্যক্তি। আপনার সঙ্গে আপনার অনেক দরিদ্র সাথি রয়েছেন। আমার কাছে কিছু সম্পদ রয়েছে, যেগুলো

আমি সদকাহ করার জন্য এনেছি। আমি এগুলো দান করার ব্যাপারে আপনাদের অধিক হকদার বলে মনে করি।'

আমি আমার সম্পদ থেকে নিয়ে আসা খাবারদাবারগুলো নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করলাম। নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাবারগুলো দেখে তাঁর সাথিদের বললেন, 'তোমরা খাও।'

নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাত সংযত করলেন এবং আমার দেয়া জিনিস থেকে কিছুই খেলেন না।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এটি প্রথম আলামত। অতঃপর আমি তাঁর নিকট থেকে চলে এলাম। সেদিন আমি নবিকে আমার ব্যাপারে কিছুই অবহিত করলাম না এবং আমার অনুসন্ধানের ব্যাপারেও কিছু জানালাম না।

ইত্যবসরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইয়াসরিবে চলে এলেন। আমি তাঁর জন্য আরো কিছু খাবারের আয়োজন করে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। খাবারগুলো নিয়ে তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললাম, 'আমি আপনাকে সদকার সম্পদ খেতে দেখিনি। তবে আজকের এগুলো আপনার জন্য হাদিয়া। এসব আমি আপনার জন্য হাদিয়া হিসেবে নিয়ে এসেছি।'

আমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে এবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এগুলো থেকে খেলেন এবং সাহাবিদের আদেশ করলে তাঁরাও রাসুলের সঙ্গে আহার করলেন।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ দুটি হলো নবুওতের স্পষ্ট আলামত। তিনি প্রথম দুটি বিষয়েরই সত্যায়ন করেছেন।

এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাকিউল গারকাদ নামক স্থানে ছিলেন। আমি সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আজ আমার ইচ্ছা– আমি আমার শেষ আলামতটি দেখবো। যদি সত্যিই তিনি নবি হয়ে থাকেন, তবে আজকেই হবে আমার সত্যানুসন্ধানের শেষ দিন। আজকেই আমাকে সত্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে– সত্যিই তিনি শেষ নবি কি না!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন এক সাহাবার জানাজার পেছন পেছন যাচ্ছিলেন। আমিও তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করলাম।

জানাজা শেষে তিনি তাঁর সাথিদের সঙ্গে এক স্থানে বসে ছিলেন। আমি তাকে সালাম দিয়ে তাঁর পাশেই বসে পড়লাম। তাঁর পরিধানে দুটো চাদর ছিলো। তাঁর পাশে বসে আমি তাঁর পিঠের দিকে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আমি সেই চিহ্নটির ব্যাপারে উৎসুক ছিলাম, যা আমাকে আম্মুরিয়্যাহর সাধক বলে দিয়েছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখলেন। বুঝতে পারলেন যে আমি তাঁর পেছনে কিছু একটা দেখতে চাচ্ছি, আমি কোনো কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছি।

তিনি তাঁর পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে ফেললেন। আমি নুবওতের সিলমোহর দেখতে পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম সেই অবিস্মরণীয় চিহ্ন, আমার সাধক আমাকে যেমনটি বলেছিলেন। আমি সিলমোহরটির দিকে ঝুঁকে পড়লাম এবং চুমু দিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিতে লাগলাম সরওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মদ আল-আমিন, হাবিবে ইলাহির নবুওতের অপার্থিব সিলমোহর।

যুগ-যুগান্তরের প্রেম

আজ আমি পূর্ণ হলাম।
আমার আত্মা আজ অবিনশ্বরতা পেলো।
বছরের পর বছর ধরে আমার তৃষিত হৃদয় আজ সিক্ত হলো।
আমি ছিলাম আগুনপূজারি। অগ্নি উপাসক।
আমি যিশুর অনুসারী ছিলাম।
গির্জায় গির্জায় ঘুরেছি। বনে-বাদাড়ে, মরু-লোকালয়ে খুঁজেছি।
খুঁজেছি খোদার নিদর্শন। পাইনি কোথাও।
বুকের মধ্যে হাহাকার নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি একা একা।
ঘুম থেকে জেগেছি বেদনা নিয়ে– কোথায়? কোথায় তিনি?
পাগলের মতো জেরুসালেম, জেরুসালেম থেকে মসুল।

মসুল থেকে নাসিবিন, নাসিবিন থেকে আম্মুরিয়্যাহ।

আম্মুরিয়্যাহ থেকে ওয়াদি আলকুরা। সেখান থেকে ইয়াসরিব।

আজ আমার উপস্থিতি পৃথিবীর বুকে স্থায়িত্ব পেলো।

আজ আমার মানবজন্ম সার্থক হলো।

হে নবিউল আউয়াল ও আখের! সালাম আপনার করকমলে।

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

আমি মাহবা ইবনে বুজখশান ঘোষণা করছি–

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ!

আর আমার নাম রাখা হলো সালমান। সালমান ফার্সি।

***

নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে কাছে ডাকলেন, 'এদিকে এসো।'

আমি ঘুরে এলাম এবং তাঁর নিকট আমার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি সাহাবাদেরও কাছে ডাকলেন। তাঁদেরও আমার এ ঘটনা শোনাতে পছন্দ করলেন। আমি বললাম আমার জীবনবৃত্তান্ত। ভালোবাসার জন্য আমার যাযাবর সত্যানুসন্ধানী সফরের কথা শোনালাম। সকলে শুনলেন।

অতঃপর আমি ফিরে এলাম আমার মুনিবের বাড়িতে। আমার বুকের মধ্যে আনন্দের ফল্গুধারা উথলে উঠছে। আজ থেকে আমি মুসলিম। আমি শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মত। তাঁর অনুসারী। একমাত্র একক অধীশ্বর আল্লাহর উপাসক। আর কারো নয়।

ইহুদি মুনিবের কাজের ফাঁকে যখনই সুযোগ পেতাম তখনই রাসুলের দরবারে চলে যেতাম। তবে আমার ইহুদি মুনিব অত্যন্ত বদস্বভাবের ছিলো। সে আমাকে নবির দরবারে বড় একটা আসতে দিতো না। এ কারণে বদর ও উহুদের যুদ্ধে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বদা ইহুদি থেকে আমার মুক্তির ব্যাপারে ভাবতেন। একদিন আমাকে বললেন, 'সালমান! তুমি তোমার মালিকের সাথে দাসত্ব থেকে মুক্তির ব্যাপারে চুক্তি করো।'

আমি আমার মুনিবের কাছে এসে মুক্তির ব্যাপারে কথা বললাম। সে জানালো, আমাকে তিনশো খেজুরগাছের চারা সংগ্রহ করে সেগুলো রোপণ করতে হবে এবং সেগুলোর পরিচর্যা করতে হবে। যখন সেগুলোতে ফল আসবে, তখন তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। সঙ্গে চল্লিশ উকিয়া পরিমাণ অর্থও দিতে হবে।

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে চুক্তির বিস্তারিত বললাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বললেন, 'দাসত্ব থেকে মুক্তির ব্যাপারে তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো।'

সাহাবারা তাঁদের সাধ্যমতো আমাকে খেজুরগাছের চারা দিয়ে সাহায্য করলেন। এক ব্যক্তি ত্রিশটি চারা দিলেন, আরেকজন বিশটি, অপরজন পনেরোটি, আরেকজন দশটি চারা দিলেন। প্রত্যেকেই তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী আমাকে সাহায্য করলেন। একপর্যায়ে আমার তিনশো চারা হয়ে গেলো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'সালমান! তুমি যাও এবং এগুলো রোপণ করার জন্য গর্ত খনন করো। যখন গর্ত করা শেষ করবে, তখন আমার নিকট আসবে। আমি নিজ হাতে তা রোপণ করবো।'

আমি আনন্দচিত্তে গর্ত খনন করলাম। সাহাবারা আমাকে এ কাজে সাহায্য করলেন। যখন আমি কাজ শেষ করলাম, তখন রাসুলকে সংবাদ দিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার সঙ্গে বাগানে এলেন। আমরা তাকে গাছের চারা দেয়া শুরু করলাম আর তিনি নিজ হাতে তা রোপণ করতে লাগলেন। ওই সত্তার কসম! যাঁর হাতে সালমানের প্রাণ! ওই চারাগুলোর একটিও মারা যায়নি। প্রতিটি গাছ তরতাজা ও প্রাণবন্ত হয়ে বেড়ে উঠতে লাগলো।

আমি গাছের চুক্তি আদায় করেছি। এখন আমার উকিয়ার অর্থের চুক্তিটি বাকি ছিলো।

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো এক যুদ্ধের গনিমত এলো। সেখানে মুরগির ডিমের সমান এক টুকরো স্বর্ণ ছিলো। স্বর্ণখণ্ডটি দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সালমান তার মুনিবের ব্যাপারে কী করেছে? তার কি চল্লিশ উকিয়া পরিশোধ করা হয়েছে?'

তাকে জানানো হলো, না, এখন পর্যন্ত পরিশোধ করা যায়নি।

আমাকে ডাকা হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার হাতে স্বর্ণের টুকরোটি দিয়ে বললেন, 'সালমান, এটি নাও এবং তোমার যে ঋণ আছে তা পরিশোধ করো।'

আমি স্বর্ণখণ্ডটি হাতে নিয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার ওপর যে ঋণ আছে, এটা কি তার বরাবর হবে?'

তিনি বললেন, 'এটা নাও। কারণ, আল্লাহ তাআলা এর দ্বারাই তোমার ঋণ আদায় করে দেবেন।'

আমি স্বর্ণের টুকরোটি নিলাম এবং ওজন করলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, সেটি চল্লিশ উকিয়া হলো।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার মুনিবের কাছে চলে এলাম এবং তাকে স্বর্ণের টুকরোটি দিলাম। সে সানন্দে আমাকে মুক্তি দিয়ে দিলো। আমি স্বাধীন হয়ে গেলাম। আজাদ হয়ে গেলাম। আল্লার রাসুল আমাকে আবার স্বাধীন মানুষ করে নিলেন।

এরপর আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। পরবর্তী আর কোনো যুদ্ধেই আমি তাঁর সাথে অনুপস্থিত থাকিনি।

জীবন থেকে নেয়া

ইতোপূর্বে ইরান থেকে বহু মানুষ এসে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তাদের ঈমান, ইলম, দীন ও দুনিয়া এতোটা উচ্চতায়

পৌঁছতে পারেনি, যতোটা উচ্চে আরোহন করেছিলেন হজরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের রৌশনি।

তিনি ইসলামের এক মহান পুরুষ। মদিনায় তার আগমনের পরপরই তোলপাড় সৃষ্টি হয় সর্বত্র। তার অসীম সাহস, অদম্য শক্তিতে নড়েচড়ে বসে মদিনাবাসী। একাধারে তিনি মুসলিম দার্শনিক, চিকিৎসক, আইনবিদ, জ্যোতির্বিদ এবং শীর্ষস্থানীয় আধ্যাত্মিক আলেম ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ও বিভিন্ন শহরের জীবনাচার, সমরকৌশল ছিল তার নখদর্পণে। সে সময়ে বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টিতে অনেকের চেয়ে তিনি ছিলেন বেশ এগিয়ে।

হিজরি পঞ্চম বর্ষে সংঘটিত হয় খন্দক যুদ্ধ। ইহুদি পণ্ডিতদের একটি দল মুশরিকদেরকে সমবেত করতে এবং সেখানকার বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে মদিনা অভিমুখে যাচ্ছিলো। এই চরম প্রতিশোধের যুদ্ধে তাদের সঙ্গ দেয়ার জন্য মক্কাবাসীর কাছ থেকে সাহায্য কামনা করা হচ্ছিলো। নতুন এই ধর্মের মূলোৎপাটন করতে তারা আদাজল খেয়ে নামে।

বিপুল বিধ্বংসী এই যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজানো হয় এভাবে– কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের লোকেরা বাহির থেকে মদিনায় আক্রমন করবে, আর বনু কুরাইজা ভেতরে মুসলিম বাহিনীর পেছনে থেকে হামলা চালাবে। এভাবে দ্রুত মুসলিম বাহিনী উভয়মুখী হামলার কবলে পড়ে নিষ্পেষিত হয়ে যাবে। এই নিষ্পেষণ হবে মুসলমানদের জন্য এক দৃষ্টান্ত মূলক ধ্বংসাত্মক ইতিহাস!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিম সৈনিকদের প্রস্তুতির প্রাক্কালে হঠাৎ খবর এলো, এক বিশাল সেনাবহর মদিনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে। অকস্মাৎ এই সংবাদটি মুসলমানদের সব প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটায়। তাদের বিপদ খুব নিকটেই এসে পড়ার উপক্রম। চোখে ভাসছিলো আসন্ন করুণ পরিণতির দৃশ্য। কুরআনুল কারিম এই পরিস্থিতির চিত্রের বর্ণনা দেয় নিম্নের শব্দে–

'যখন তারা তোমাদের কাছে এসেছিলো তোমাদের ওপরের দিক থেকে এবং তোমাদের নিচের দিক থেকে, আর যখন চোখগুলো বাঁকা হয়ে পড়েছিলো এবং প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছেছিলো; আর তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা রকম ধারণা পোষণ করছিলে।' (সুরা আহজাব, আয়াত ১০)

আবু সুফিয়ান এবং উয়াইনা ইবনে হাসানের নেতৃত্বে চৌদ্দ হাজার সৈন্যের বিশাল বহরটি মদিনা অভিমুখে আসছে। তাদের মনোবাসনা– মদিনার মুসলমানদের তারা চিরতরে গোলাম বানিয়ে রাখবে। আর এমন কঠিন শাস্তি দেবে যাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবি ও তাঁর দীন সমূলে নিপাত যায়। এ বাহিনী কেবলমাত্র কুরাইশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না; বরং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী প্রত্যেক গোত্রের যোদ্ধা এতে অংশ নেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সমুদয় শত্রু ব্যক্তিগতভাবে ও গোষ্ঠীগতভাবে তথা সামগ্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে আসে।

এদিকে মুসলমানরা এমন পরিস্থিতি দেখে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরামর্শের জন্য সাহাবাদের সমবেত করলেন। সকলেই সাগ্রহে জিহাদে শরিক হতে প্রস্তুত। প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব। কিন্তু কীভাবে কাফেরদের মোকাবেলা করা যাবে?

এমন নাজুক পরিস্থিতিতে দীর্ঘ গোড়ালি আর ঘন চুলের অধিকারী এক ব্যক্তি সম্মুখপানে আসছেন। এই ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভীষণ ভালোবাসেন। খুবই সম্মান করে থাকেন তাকে।

হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে আসছেন। পারস্যে পরিখা খনন করে নগরের নিরাপত্তা সাধন করা হয় বলে জানালেন তিনি। হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিজ দেশ পারস্য (ইরান)-এর অনেক যুদ্ধ কৌশল ও সরমজ্ঞানের বিদ্বান ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখতেন। মদিনার অরক্ষিত দিকে পরিখা খনন করে নগরীর হেফাজত করা সমীচীন বলে তিনি পরামর্শ দেন। যে

কৌশল সম্পর্কে পূর্বে আরবদের কোনো ধারণা ছিলো না। কেননা শত্রুবাহিনী এদিক হতে হামলা চালানোর প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

এ পরামর্শ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মনঃপূত হয়। মদিনার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সুদীর্ঘ পরিখা খনন করে বিশাল কুরাইশ বাহিনীর আক্রমণ সহজে প্রতিরোধ করা হয়। আল্লাহই ভালো জানেন; মুসলিম বাহিনী যদি পরিখা খনন না করতো, তাহলে এ যুদ্ধ কী ভয়াবহ পরিণত ডেকে আনতো!

এটা সেই পরিখা– যা দেখে কুরাইশরা হতভম্ব হয়ে যায়। গোটা বাহিনী দীর্ঘ এক মাস ধরে এখানে আটকা পড়ে। তারা মদিনায় আক্রমণ করার কোনো সুযোগই পায় না। শেষে আল্লাহ তায়ালা একরাতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এতে করে কাফের বাহিনী দিগ্বিদিক ছুটে যায়। তাদের তাবু ওলট-পালট হয়ে যায়। তাদের বাহিনীতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান তার বাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়। ব্যর্থ হয়ে পড়ে গোটা সৈন্যবাহিনী। ভগ্ন মনোরথে ফিরে আসতে বাধ্য হয় তারা।

***

পরিখা খননের সময় হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের সাথে ছিলেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় বহু কষ্ট সহ্য করে পরিখা খননের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেও এই পরিখা বা খন্দক খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন। নিজ হাতে কোদাল নেন এবং গর্ত খুঁড়তে থাকেন।

হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বেশ দৃঢ় পেশীবহুল, শক্তিশালী এবং শারীরিকভাবে বেশ সুঠাম লোক। সর্বশক্তি দিয়ে তিনি পরিখা খনন করে যাচ্ছেন। তার এক আঘাতেই পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ এমন একটি পাথর সামনে আসে– যার সামনে তিনি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন। তার সঙ্গী-সাথী সকলে মিলে এটা এক বিন্দুও টলাতে পারছেন না। বহু চেষ্টা করে যাচ্ছেন পাথরটি ভাঙার জন্য, কিন্তু কিছুতেই কাজ হচ্ছে না।

পরে হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এসে পরিখার সামনে এমন বৃহৎ ও দুর্লঙ্ঘ পাথর এসে পড়ায়, পরিখার মোড় পরিবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ঘটনা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে স্বয়ং সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং পাথরটি দেখতে থাকেন। তিনি একটি কোদাল তালাশ করেন। সাহাবাদের পাথরখণ্ড গড়িয়ে পড়ার সম্ভাব্য স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নাম নিয়ে উভয় হাতে কোদাল ধরে দৃঢ় হিম্মত বুকে নিয়ে সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে পাথরে আঘাত করেন। আঘাতের সাথে সাথে বিদ্যুতের মতো বিশাল এক বিচ্ছুরণ দেখা দেয়– যা চতুর্পাশ আলোকিত করে ফেলে। হজরত সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন– আমি সেই আলোক বিচ্ছুরণ দেখেছি যাতে মদিনার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে পড়েছিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উচ্চকণ্ঠে কালিমায়ে তাওহিদ পড়ে বলছিলেন– 'আল্লাহই সবার চেয়ে বড়। আমাকে পারস্যের চাবি দিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার সম্মুখে হীরের মহল, কিসরা ও মাদায়েনকে আলোকিত করে দেয়া হয়েছে। আমার উম্মত এটা ছিনিয়ে আনবেই।'

তিনি আবারও কোদাল উঁচু করে ধরলেন এবং পাথরের ওপর দ্বিতীয়বারের মতো প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলেন। কিন্তু পাথর আগের মতো দুর্লঙ্ঘই থেকে গেলো। অবশ্য আগেরবারের মতো আঘাতের সাথে সাথে বিদ্যুতের মতো বিশাল এক বিচ্ছুরণ দেখা দেয়– যা চতুর্পাশ আলোকিত করে ফেলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উচ্চকণ্ঠে কালিমায়ে তাওহিদ পড়ে আবারও বললেন– 'আল্লাহই সবার চেয়ে বড়। আমাকে রোমের চাবি দিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সেখানকার লাল লাল দালান-কোঠা আমার সম্মুখে আলোকিত করে দেয়া হয়েছে। অতিসত্বর আমার উম্মত এটা জয় করবে।'

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারের মতো সজোরে আঘাত করলে পাথরটি ভেঙ্গে যায়। এবার আঘাতের সাথে সাথে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিদ্যুতের মতো বিশাল এক

বিচ্ছুরণ দেখা দেয়– যা চতুর্পাশ আরো বেশি করে আলোকিত করে ফেলেছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে কালিমায়ে তাওহিদ বললে উপস্থিত সকল সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে নারায়ে তাকবির বলে উঠলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বললেন– এবার সিরিয়া, সানআ এবং অন্যান্য শহর দেখানো হয়েছে, যেখানে একদিন ইসলামের আলো পৌঁছবেই।

মুসলমানগণ এ ভবিষদ্বাণী শুনে বললেন– 'এটা ওই বস্তু– যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতিশ্রুতি তো সর্বদাই সত্য হয়।'

হজরত সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সুসংবাদ পূরণ হওয়া পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি পারস্য ও রোমের মাদায়েন, সানআ, সিরিয়া মিসর ও ইরাকের বিভিন্ন মহল দেখেছেন। তিনি আরো দেখেছেন, কীভাবে সুবিশাল উঁচু উঁচু মিনার হতে মঙ্গল আর হেদায়াতের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে! তাওহিদের কেমন আলোকোজ্জ্বল শিখা জ্বলজ্বল করে উঠছিলো সর্বত্র!

খন্দকের যুদ্ধে আনসারগণ বলতে থাকেন– সালমান আমাদের। এদিকে মুহাজিররাও বলতে থাকেন– না! সালমান আমাদের! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের এ বাকবিতণ্ডার সমাধান দিতে গিয়ে বললেন– 'সালমান আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।'

হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জুহদ, দৃঢ়তা, তাকওয়া ও খোদাভীতির ক্ষেত্রে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো ছিলেন।

তিনি হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে কয়েকদিন একই ঘরে অবস্থান করেছিলেন। হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু দিনের বেলা রোজা রাখতেন আর সারা রাত নফল নামাজ পড়তেন। হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এমন অতিরিক্ত আমল করতে বারণ করতেন।

একদিন হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নফল নামাজ পড়তে নিষেধ করতে চাইলে হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে তাকে ধমক দিয়ে বললেন– 'আপনি কি আমাকে এ থেকে বিরত রাখতে চান যে, আমি আমার রবের জন্য রোজা রাখবো এবং তাঁর জন্যই নামাজ পড়বো?'

হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জবাবে বললেন– 'নিঃসন্দেহে আপনার চোখের ওপর আপনার হক আছে। আপনার পরিবারের ওপর আপনার হক আছে। আপনি রোজাও রাখুন, ছেড়েও দিন। নামাজও পড়ুন, আবার নিদ্রাও যান।'

এ কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কানে পৌছলে তিনি বলেন– 'সালমানকে ইলম দ্বারা টইটম্বুর করে দেয়া হয়েছে।'

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের এমন উচ্চ প্রশংসা করতেন; যেমন প্রশংসা করতেন তার দীন ও চরিত্র সম্পর্কে।

অবশ্যই হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার যথাযোগ্য পাত্র ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হজরত সালমানের জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে। এ কারণে তিনি ইলম ও মারেফাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার ইন্তে কালের পর তার ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন– 'তিনি আমাদের মধ্য থেকে ছিলেন। তার সম্পৃক্ততা ছিলো আমাদের আহলে বাইতের সাথে। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো– যে হজরত লোকমান হাকিমের মতো? সালমান ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে লোকমান হাকিমের সমতুল্য। ইলমে আউয়াল ও ইলমে আখের সকল ইলমের আলেম ছিলেন তিনি। তিনি সর্বপ্রথম কিতাবও পড়েছেন, আবার সর্বশেষ কিতাবও তেলাওয়াত করেছেন। তিনি তো ছিলেন কূল-কিনারাবিহীন সাগরের মতো!'

হজরত সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল সাহাবার অন্তরে পরম সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু

আনহু খেলাফতকালে তিনি মদিনায় জেয়ারতের উদ্দেশে এলে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনভাবে তাকে স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানান– যা অন্য কারো বেলায় ঘটেনি। তিনি তার সকল সঙ্গীদের সমবেত করে বললেন– এসো! চলো আমরা সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অভ্যর্থনা জানাই! পরে তিনি সবাইকে নিয়ে হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বাগত জানাতে মদিনার উপকণ্ঠে চলে আসেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত এবং তার ওপর ঈমান আনার পর হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন আযাদ তথা স্বাধীন মুসলমান, মুজাহিদ ও আবেদের মতো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথেই জীবন কাটাতে থাকেন। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালে তাদের সঙ্গ দেন।

তখনকার সময়ে খুব অধিকহারে মদিনাবাসী বিত্তবৈভবে দিন কাটাতে থাকে। চতুর্দিক থেকে কর, জিযিয়া ইত্যাতি আসতে থাকে বিপুলহারে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের সুবাতাস। একের পর এক ভূখণ্ড মুসলমানদের করতলগত হতে থাকে। দিনদিন বাড়তে থাকে মুসলিম সালতানাতের সীমানা। এতদসঙ্গে দায়িত্বশীলদের চাহিদাও বেড়ে যায়। পাশাপাশি বাড়তে থাকে দায়িত্বশীলদের কার্যপরিধি। কিন্তু এমন সময়ে কী ছিলো হজরত সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভূমিকা? মুসলমানদের এমন বিলাসবহুল, আয়েশি আর স্বচ্ছলতার দিনে তাকে আমরা কী রূপে দেখতে পাই?

আপনারা কি দেখছেন না কর্মব্যস্ত, অগাধ জ্ঞানী ব্যক্তি– যিনি সবুজ বৃক্ষের ছায়ায় বসে বসে দীনের প্রভুত খেদমত ও খলিফা কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ! তিনিই সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু...!

ভালো করে দৃষ্টি দিন তাঁর দিকে। স্বচ্ছলতা, বিত্তবৈভবের এমন আধিক্যের কালে তার বার্ষিক সম্মানী ভাতা চার হাজার থেকে ছয় হাজার দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু তিনি সেই সম্মানী ভাতার সবটুকুই আল্লাহর

রাস্তায় বণ্টন করে দিতেন। সেখান থেকে একটি দিরহাম নিতেও তিনি অস্বীকৃতি জানাতেন। বলতেন– 'আমি এক দিরহাম দিয়ে একটি খেজুর পাতা কিনবো। তা দিয়ে টুকরি বানিয়ে তিন দিরহাম দিয়ে বাজারে বিক্রি করবো। এক দিরহাম আমি পূর্বের বিক্রেতাকে দেবো, এক দিরহাম নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণে ব্যয় করবো, আর অবশিষ্ট দিরহাম সদকা করে দেবো। যদি ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুও আমাকে এমন কাজ করতে বারণ করেন– তাও আমি শুনবো না।'

তার অবস্থা তো এমন যে, তিনি কখনো কারো দেয়া উপহার ও বখশিশ এমন কি বেতন-ভাতাও গ্রহণ করতেন না। নেতৃত্ব ও ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে থাকতেন। বলতেন– 'যদি তোমার মাটি ভক্ষণ করতে হয়, তবে তা-ই খেয়ে নাও; তবুও দুই ব্যক্তির মাঝে নেতা হয়ো না।'

এভাবেই তিনি যাবতীয় নেতৃত্ব ও ক্ষমতা থেকে দূরে থাকতেন। শুধুমাত্র তখন তা গ্রহণ করতেন– যখন জিহাদের ময়দানে খুবই প্রয়োজন পড়তো বা তার বিকল্প থাকতো না। তাও বহু পীড়াপীড়ির পর সেই নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করতেন। আর নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভীষণ কান্নাকাটি করতেন এবং ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন। তথাপি অবস্থা এমন হতো যে, তিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের বিনিময়ে ন্যায্যভাবে প্রাপ্ত হালাল ভাতাটুকু কখনো গ্রহণ করতেন না। হিশাম ইবনে হাস্‌সান হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন– 'সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা পেতেন, তিরিশ হাজার লোকের ওপর হুকুম জারি করতেন তখনও তার একটি মাত্র জামা ছিলো। তার মধ্যে ভরে তিনি কাঠ সংগ্রহ করতেন। ঘুমানোর সময় জামাটির এক পাশ গায়ে দিতেন এবং অন্য পাশ বিছাতেন। তাকে যখন সেই ভাতাগুলো দেয়া হতো, তখন তিনি তা ফেরত দিতেন। নিজ হাতে কামাই করে তিনি খেতেন।'

তিনি মৃত্যুশয্যায়। স্বীয় আত্মা পরম করুণাময় ও দয়ালু প্রভুর দরবারে সমর্পণে মাতোয়ারা। হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে আসেন। তাকে দেখে হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সজোরে কান্না আরম্ভ করলেন। হজরত সাদ

রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন– 'হে আবু আবদুল্লাহ! কী কারণে আপনি কাঁদছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো আপনার ওপর সন্তুষ্ট হয়েই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলেন– 'আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না। দুনিয়ার কোনো লালসাও আমাকে কাঁদাচ্ছে না। কান্নার কারণ হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম যেন একজন মুসাফিরের সাজ-সরঞ্জাম থেকে বেশি না হয়। অথচ আমার কাছে এতোগুলো জিনিসপত্র জমা হয়ে গেছে!'

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেই জিনিসগুলো একটি বড় পেয়ালা, তামার একটি থালা ও একটি পানির পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি তাকে বললাম– 'হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কি আমাদের কিছু অসিয়ত করবেন?'

তিনি বললেন– 'হে সাদ! যখন তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে। যখন কোনো বিচার করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে, যখন কোনো কিছু বণ্টন করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে।'

তিনি ঐ মহান ব্যক্তি– যিনি স্বীয় নফসকে জাগতিক আরাম-আয়েশ, ধন-সম্পদ, বেতন-ভাতা থেকে এতো দূরে থেকেছেন, যে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের অসিয়ত করেছিলেন। যাতে তারা জাগতিক ব্যাপারে দাওয়াত না দেন। কেননা এতে দুনিয়া তাদের ওপর ভর করতে পারে। আর কেউ যেন একজন মুসাফিরের চেয়ে অধিক সম্পদ দুনিয়ায় রেখে না যায়। হজরত সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহু এই অসিয়ত মতে পুঙ্খাণুপুঙ্খভাবে চলেছেন। এ কারণে অন্তিম শয়নেও তিনি এ ভাবনায় বিচলিত যে, রাসুলের দেয়া সেই কথার ব্যত্যয় আমার পক্ষ থেকে ঘটে যাচ্ছে কিনা!

একবার তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। এমন সময়ে সিরিয়া থেকে আগত জনৈক ব্যক্তি তাকে দেখলো। আগত ব্যক্তির কাঁধে আনার আর খেজুরের বেশ কয়েকটি বস্তা। অনেক দূর থেকে এই বস্তা বহন করতে

করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে তার সামনে যে ব্যক্তিকে দেখছে— তাকে দেখতে অনেকটা সাধারণ ফকিরের মতো মনে হচ্ছে। আগন্তুক ভাবলো— বস্তাগুলো এই লোকের কাঁধে তুলে দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে তাকে কিছু মজুরি বিনিময় হিসেবে দেবো। এই ভাবনায় সে সামনের লোককে ইশারা করলো। সে কাছে এলে আগন্তুক বললো— 'এই বস্তাটি কাঁধে নাও।'

লোকটি বস্তা কাঁধে উঠিয়ে নিলো। উভয়ে চলতে আরম্ভ করলো। তারা রাস্তায় কিছু লোকের সামনে দিয়ে এগিয়ে চললো। এই লোক তাদেরকে সালাম দিলে সবাই দাঁড়িয়ে বললো— 'আমিরের ওপরও সালাম বর্ষিত হোক।'

এটা কেমন কথা! আমির বলে এ লোকেরা কী বোঝাতে চাচ্ছে! আগন্তুক মনে মনে চিন্তা করতে থাকে। তার ভয় আর শঙ্কার মাত্রা আরো বাড়তে থাকে যখন কিছু লোক দ্রুত এগিয়ে এসে বললো— 'জনাব আমির! আপনার বদলে আমরাই এই বস্তা বহন করি!'

লোকটি যখন টের পেলো যে, এই বস্তা বহনকারী লোকটি হচ্ছেন মাদায়েনের গভর্নর হজরত সালমান ফারেসি রাদিয়াল্লাহু আনহু, তখন তার হাত থেকে তার সামানগুলো ফসকে গেলো। সে তৎক্ষণাত দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে এবং বস্তাগুলো নিজের কাঁধে বহন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু না। হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মাথা নাড়িয়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন— 'তোমাকে আমি তোমার গন্তব্য পর্যন্ত এই বস্তা পৌঁছিয়ে দেবো।'

একবার তাকে নেতৃত্বের প্রতি বিতৃষ্ণার হেতু সম্পর্কে জানতে চাইলে জবাবে তিনি বললেন— 'নেতৃত্ব গ্রহণ করা খুবই মজার, কিন্তু ছেড়ে দেয়া বেশ তিক্ত।'

একবার কোনো একজন সুহৃদ তার কাছে এসে দেখছেন তিনি আটা পিষছেন। সুহৃদ জিজ্ঞেস করলেন— 'আপনার খাদেম কোথায়?'

হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন— 'আমি তাকে একটি কাজে পাঠিয়েছি। তো, আমার এটি ভালো মনে হচ্ছে না যে, তাকে দিয়ে আমি দু'টি কাজই করাবো!'

এক ঘর নির্মাতা তার কাছে অনুমতি চাইলো তাকে একটি ঘর বানিয়ে দেওয়ার। তিনি নিষেধ করলেন। বারবার পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন ঘর বানাবে?'

লোকটি বললো– 'এতো ছোট যে, দাঁড়ালে মাথায় চাল ঠেকে যাবে এবং শুয়ে পড়লে দেয়ালে পা লেগে যাবে।'

এ কথায় তিনি রাজি হলেন। তার জন্য একটি ঝুপড়ি তৈরি করা হলো।

জীবন ধারণের অজস্র উপকরণের মধ্যে কোনো কিছুর প্রতিই তার বিন্দু পরিমাণ লোভ ছিলো না। হ্যাঁ, তবে একটি বস্তু ছিলো। জীবনভর তিনি এর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। কিংবা হতে পারে তিনি তা পেতে আগ্রহী ছিলেন। যে বস্তুটি তার ভীষণ প্রিয় ছিলো, তার রহস্য জানতেন কেবলমাত্র তার স্ত্রী। তা হচ্ছে– একটি সুগন্ধি ছোট্ট বোতল। যা তিনি 'জালুলা' বিজয়ের পর গনিমত হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনি সেটা তার মৃত্যুর সময় ব্যবহার করার আশায় রেখে দিয়েছিলেন। তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন– এটা দূরে কোনো এক নিরপদ স্থানে রেখে দাও।

মৃত্যুশয্যায় যেদিন তাঁর প্রাণবায়ু উড়ে যাবে স্রষ্টার সকাশে, সেদিন তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন– 'ওই বস্তুটি নিয়ে এসো যা তোমাকে সযতনে রেখে দিতে বলেছিলাম।'

স্ত্রী সেই ছোট্ট সুগন্ধি বোতলটি নিয়ে হাজির হলেন। তিনি একটি পানির পাত্র চাইলেন। সুগন্ধিগুলো সেটাতে ছড়িয়ে দিলেন। এরপর নিজ হাত গায়ে মাখলেন এবং স্ত্রীকে বললেন– 'আমার আশেপাশে এগুলো ছিটিয়ে দাও। এখন আমার কাছে আল্লাহর একজন মাখলুক আসবেন যিনি খাওয়া-দাওয়া করেন না, তবে খুশবু পছন্দ করেন।'

স্ত্রী খুশবু ছিটিয়ে দিলে পরে তিনি বললেন– 'দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে যাও।' স্ত্রী কথামতো কাজ করলেন। কিছুক্ষণ পর এসে দেখলেন– তার পবিত্র রুহ শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। তার আত্মা চলে গেছে ঊর্ধ্বাকাশে। তার ইচ্ছেরা সেখানে পায়রা হয়ে উড়ছে। যে সম্মানিত স্থানের সুসংবাদ তিনি পেয়েছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবা আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে। যেখানে বিচরণ করে শহিদ আর পুণ্যাত্মারা!

ক্রীতদাস-পুত্র

কাবা চত্বরে

বেলা দ্বিপ্রহর। আরবের ধু ধু মরুর মাঝে ছোট্ট নগরী মক্কা। অন্ধ বংশগৌরব আর গোত্রকৌলিন্যে মত্ত কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কাবার পাদদেশে আলোচনারত। নেতৃস্থানীয় সবাই উপস্থিত সেখানে। সারা দিন তারা এখানে বসেই অলস সময় কাটায়। বিশেষত কুরাইশরা। কাবা সে সময়ে কুরাইশদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। আরব উপদ্বীপে প্রশ্নাতীত নেতৃত্বের চাবিকাঠি তাদের হাতেই। কাবার ধারক-বাহক হিসেবে তাদের রয়েছে আলাদা আভিজাত্যের গৌরব।

তাদের আলোচনা চলছিলো আরবের কিংবদন্তি কবি ইমরাউল কায়েসকে নিয়ে। তার কাব্যপ্রতিভা আর নারীদেহের উপমা কতোটা জুতসইভাবে সংবেদন তৈরি করেছে তার কাব্যে, সেটাই ছিলো তর্কের বিষয়।

এমন সময়ে সেখানে এক সৌম্যকান্তি মানুষের উপস্থিতি দেখা গেলো। জনপদের সুপরিচিত চল্লিশোর্ধ্ব এ ব্যক্তির সাথে তাঁর তরুণ ক্রীতদাসটিও হাজির। ব্যক্তিটির চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার মুহূর্তেই যে কারো সমীহ আদায় করে নেয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সমগ্র জনপদের নয়নের মণি হিসেবে বিবেচিত ছিলেন এ পরোপকারী ব্যক্তিটি। কিন্তু এখন সবার চক্ষুশূল। হতদরিদ্র, অনাথ হিসেবে জীবনের শুরু হলেও যৌবনে নগরীর সবচাইতে ধনী মহিলার পাণিগ্রহণ তাঁর

অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছিলো। খাদিজা নামের ওই নারী ভালোবেসে নিজের সকল সহায়-সম্পত্তি তুলে দিয়েছিলেন এই অনুপম চরিত্রের অধিকারী মানুষটির হাতে।

অবশ্য, এতে তাঁর পরোপকারিতায় কোনো ঘাটতি দেখা দেয়নি একবারের জন্যও। মানুষের সাথে আচরণেও কোনো অভব্যতা প্রকাশ পায়নি কোনো দিন। ফলে সকলের ভালোবাসার পাত্র হিসেবে সমাজে বিচরণ করছিলেন তিনি। তাঁর বিপক্ষে দু' কথা বলার মতো লোক পাওয়া যেতো না মক্কা তো বটেই, সারা আরবেও না।

কিন্তু সমস্যার শুরু হলো তখনই, যখন তিনি এক নতুন মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হলেন; যখন তিনি বর্ণ-গোত্র-বংশ-ধনী-গরিব নির্বিশেষে মানুষের মাঝে টেনে দেয়া কৃত্রিম বিভেদের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে সবাইকে সাম্যের কাতারে আনতে চাইলেন।

আরবের সংস্কৃতি ও সমাজে হাজার বছরের লালিত কুসংস্কার আর নেতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত হয়ে আসা এই মতাদর্শ জনপদের অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর সুখনিদ্রা কেড়ে নিয়েছিলো। বসে বসে তাই তারা সারাক্ষণ ফন্দি আঁটে–কেমন করে এই আদর্শের প্রচার বন্ধ করে দেয়া যায়।

কুরাইশদের আলোচনা তখন তুঙ্গে। একজন আরেকজনের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তির শেল। গলা চড়িয়ে আবৃত্তি করছিলো কেউ কেউ। সৌম্যকান্তি মানুষটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না! কোনো রকম ভণিতায় না গিয়ে সরাসরি সাথে থাকা ক্রীতদাস তরুণটির দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, 'এ হচ্ছে জায়িদ। আজ হতে সে মুক্ত এবং আমার পুত্র। সে আমার উত্তরাধিকারী হবে আর আমি তার উত্তরাধিকারী হবো।'

কী আশ্চর্যের কথা!

তাকে কাবা চত্বরে আসতে দেখেই কুরাইশদের আলোচনা থেমে গিয়েছিলো। যখন তিনি কথা বলে উঠলেন, কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস পেলো না। সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলো সে ঘোষণা। এ কী করে সম্ভব! বলা নেই, কওয়া নেই উকাজের বাজার হতে একটা কিনে আনা দাসকে মুক্ত করে দিয়েছে! সেটা না হয় মেনে নেয়া গেলো, তাই বলে

তাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাতে হবে? সে কি এ সমাজের রীতিনীতি সব উল্টে দিতে চায়? গোত্রের কৌলিন্য আর আরবের ঐতিহ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায়?

তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। সপ্তম শতকে আরবের মরুচারী সমাজকে তিনি বদলে দেবার অনমনীয় প্রতিজ্ঞা নিয়েই কাজে নেমেছিলেন। আর সে পরিবর্তনের শুরু করেছিলেন নিজের অন্দরমহল হতে। আভিজাত্যে মদমত্ত নির্বোধ কুরাইশরা সেটা বুঝতে একটু দেরি করে ফেলেছিলো। নিজেদের অনর্থক অহমিকা তাদের করে রেখেছিলো অন্ধ। তাদের চোখে তখনো উদ্ভাসিত হয়নি সত্য চেনার আলোকবর্তিকা।

তখনকার আরব ছিলো পৃথিবীর অন্যান্য সকল অঞ্চলের চেয়ে অনেক পিছিয়ে, অনেক অন্ধকার। শিক্ষা আর আত্মশুদ্ধির পথের ব্যাপারে তারা ছিলো একেবারেই বেখবর। এ ছিলো এমন এক পৃথিবী, যেখানে মানুষের সংখ্যা কম ছিলো না, মানবতার অভাব ছিলো প্রকট। সাধারণ মানুষের জীবন-সম্মান-সম্পদ সবকিছু যেখানে ক্ষমতাবানের খেলার পুতুল মাত্র, সেখানে একজন ক্রীতদাসের অধিকার বলে কোনো কিছু থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বাজারের ক্রীতদাস আর বনের পশুর মাঝে তেমন পার্থক্য করা হতো না সে সমাজে। এমন সমাজে একটা 'নিকৃষ্ট' ক্রীতদাসকে শুধু মুক্ত করে দেয়াই নয়, নিজের পুত্র বলে স্বীকৃতি প্রদান–একটা প্রবল ভূকম্পন ছাড়া আর কী!

সেদিন হতে মুক্ত ক্রীতদাস জায়িদ, ততোদিন পর্যন্ত জায়িদ ইবনে মুহাম্মদ (মোহাম্মদের পুত্র জায়িদ) নামে সমাজে পরিচিত হলেন, যতোদিন না কোরআনের আমোঘ বাণী রক্তের সম্পর্কিত পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতৃপরিচয় দানের কুসংস্কার রহিত করে।

সরদারপুত্র থেকে ক্রীতদাস

জায়িদের পরিচয়টা যদি জানতে হয়, তাহলে আমাদের আরেকটু পেছনে ফিরে যেতে হবে। চলে যেতে হবে আরব থেকে আরেকটু দূরে, লোহিত সাগরের পাড়ে।

লোহিত সাগরের তীরঘেঁষা দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন অঞ্চল। আরব উপদ্বীপের স্বভাবজাত রুক্ষ প্রকৃতির মাঝে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এ উর্বর এলাকাটি ইতিহাসের নানান উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে থেকে সব সময় নিজেকে সমৃদ্ধ রেখেছে। গ্রিক দার্শনিক টলেমি এর নাম দিয়েছিলেন 'অ্যারাবিয়া ফেলিক্স' বা 'উর্বর আরব'। কৃষি কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যে এ অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্যগতভাবেই।

ইয়েমেনের এ অঞ্চলেই প্রভাবশালী গোত্র বনু কুজায়ার বাস। গোত্রপতি হারিসা ইবনে শুরাহবিল। স্ত্রী সুদা বিনতে সালাবাহও আরবের আরেক বিখ্যাত তায়ি গোত্রের কন্যা। ইতিহাসখ্যাত হাতিম তায়ি এ গোত্রেই জন্মেছিলেন। এ দম্পতিরই আদরের পুত্র জায়িদ; দুরন্ত-আদুরে। পরিবারের সকলের নয়নমণি।

জায়িদের মা সুদা অনেককাল ধরে বাবার বাড়ি যেতে পারছিলেন না। মূলত সে সময়টাই ছিলো নিরাপত্তাহীনতার। হত্যা-লুটতরাজ যে জনপদের মানুষের জীবনের প্রাথমিক অনুষঙ্গ, সেখানে এতো দূরের পথ নিরাপদে পাড়ি দেয়াটা কঠিন বৈকি! হারিসা ব্যস্ততার ফাঁকে সময় দিতে পারেন না। তাই আট বছরের বালক জায়িদকে নিয়ে মা সুদা একদিন এক কাফেলার সাথে বাবার বাড়ির পথ ধরেন। স্ত্রী-সন্তানকে উটের পিঠে বসিয়ে বিদায় দেয়ার সময় হারিসার বুক কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। ঠিকমতো পৌঁছাতে পারবে তো? ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন হারিসা।

পথে কোনো সমস্যা হলো না। নিরাপদে মাতা-পুত্র পৌঁছে গেলেন গন্তব্যে। খবর পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন হারিসা। কিন্তু বিধির বিধান না যায় খণ্ডন। পথের বিপদ বাড়িতে এসে পড়ে। এক রাতে বনু তায়িির বসতির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনু কাইনের দুর্বৃত্তরা। অন্য অনেকের সাথে অপহৃত হন জায়িদ। তাকে তুলে নিয়ে যায় হামলাকারীরা। সন্তান হারিয়ে বুকফাটা আর্তনাদে ফেটে পড়েন সুদা।

উকাজের মেলায়

এই সেই উকাজ বাজার। আরবের সবচেয়ে বিখ্যাত বাজার। সাধু আর শয়তান সমানভাবে সমাদৃত হয় এখানে। আজ এখানে মেলা হচ্ছে। উকাজের মেলা আরবের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক মেলা। সারা উপদ্বীপ এবং উপদ্বীপের বাইরে থেকে হাজারো ব্যবসায়ী রাজ্যের পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসে তায়েফ শহরের সন্নিকটের এই মেলায়।

আরবে দাস ব্যবসার সে সময়ে রমরমা অবস্থা। আর উকাজ হচ্ছে সে ব্যবসার এক লোভনীয় বাজার। দেদার বিক্রি হয় দাস-দাসী। কারো কোনো বাছবিচার নেই।

হাকিম ইবনে হিজাম। সম্পর্কে রাসুলপত্নী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাগনে। তিনিও এসেছেন উকাজ বাজারে। ফুফু খাদিজা ইবনে খুয়াইলিদের বিয়ে উপলক্ষে একটি ভালো উপহার ক্রয় করতে এসেছেন। ফুফু অল্প ক'দিন হয় স্বনামধন্য যুবক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকে বিয়ে করেছেন। ফলে দুই কারণে হাকিম খুশি হয়েছে- ফুফু অনেক দিন বিধবা ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি বিয়ে করেছেন। দ্বিতীয় কারণ হলো, তার স্বামী মুহাম্মদ। অসম্ভব ভালো একজন মানুষ। এমন লোককে বিয়ে করেছেন বলে ফুফুকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না।

সেই খুশিতেই আজ ফুফুকে উপহার দেয়ার জন্য কিছু একটা কিনতে এসেছেন উকাজের বাজারে। অনেক খুঁজেপেতে হাকিম ফুফুর জন্য একটা সুদর্শন বালক ক্রীতদাস কিনে নেন এবং উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেন। ফুফু খাদিজা সে বালককে প্রিয়তম স্বামীর সেবার জন্য নিয়োজিত করেন। এ বালকটিই জায়িদ। রাসুলের পালকপুত্র জায়িদ ইবনে হারিসা। একদিন যে ইসলামের ইতিহাসের বহুলাংশে মিশে যান জায়িদ ইবনে হারিসা নামে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখনো নবুওতপ্রাপ্ত হননি। নবি হিসেবে তখনো আবির্ভাব ঘটেনি তার। সে সময়ে তিনি সমাজের মানুষের উপকারে ব্যস্ত, ব্যস্ত আত্মানুসন্ধানে। একদিকে 'হিলফুল ফুজুল'-এর মাধ্যমে সমাজের দুঃখী-অত্যাচারিতের পাশে এসে

দাঁড়াচ্ছেন। অন্যদিকে এর স্থায়ী সমাধানের পথ অনুসন্ধানে একটু একটু করে খোদার ধ্যানে মগ্ন হয়ে উঠছেন।

এমন সময়টাতেই জায়িদ এলেন খাদিজার পরিবারে। এসে মুনিব হিসেবে পেলেন মুহাম্মদকে। কয়েক দিনেই কিশোর জায়িদ এই ব্যক্তির ভালোবাসা আর স্নেহে তাঁর ভক্ত হয়ে গেলেন। আকর্ষণীয় এক মুনিব পেয়ে নতুন জীবনের শুরু হলো জায়িদের। আরবের অন্য মুনিবরা যেখানে ক্রীতদাসদের পশুরও অধম মনে করে, সেখানে জায়িদ তার মালিকের ঘরে পুত্রস্নেহে লালিত হতে থাকেন। শৈশবে হারানো পিতা-মাতার অভাব এক্প্রকার ভুলতেই বসেন তিনি।

পিতৃপরিচয়

জায়িদ ছোট ছিলেন। তার মনটাও ছোট, নরোম। সেখানে যে দৃশ্য রাখা হয়, সেটাই স্থায়ী হয় না খুব বেশি। শিশুরা অতীত ভুলে যায় দ্রুত। এ কারণে মা-বাবার কথা খুব একটা মনে পড়তো না জায়িদের।

কিন্তু সন্তান মা-বাবাকে ভুলে থাকতে পারে, মা-বাবা কি পারেন সন্তানকে ভুলতে? কখনোই পারেন না। হারিসা প্রতি মুহূর্তে হারানো সন্তানের খোঁজ চালিয়ে যেতে থাকেন। মা সুদা বুকের ধনকে হারিয়ে অশ্রু বিসর্জন দেন একাকী ঘরে।

এভাবেই প্রায় এক যুগের অনুসন্ধান শেষে একসময় হারিসা জানতে পারেন, তার ছেলে জায়িদ এখন মক্কায় আছে। আছে ক্রীতদাস হিসেবে। হারিসা ছুটলেন মক্কাপানে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ততোদিনে তাওহিদের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন মক্কার হেরা পর্বতে। চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন আল কোরআনের ঐশীধ্বনি। মানুষকে মূর্তিপূজা আর জড়পূজার অনর্থক উপাসনা ছেড়ে ডাকছেন এক আল্লাহর ইবাদতে। মানুষ হয়ে মানুষের খোদা হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন সাম্য, ভ্রাতৃত্ব আর মানবতা। তাঁর এ নতুন মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়েছেন মক্কার মুষ্টিমেয় যে কজন ব্যক্তি, সদ্যযুবক জায়িদ তাদেরই একজন।

ওদিকে জায়িদের পিতা হারিসা ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছেন মক্কায়। মক্কার লোকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন

জায়িদ নামের একটি ছেলে থাকে মুহাম্মদের সঙ্গে। হারিসা তার ভাই কাআবকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তাকে নিয়ে সোজা চলে এলেন নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দোরগোড়ায়। আর্জি একটাই– যতো অর্থ লাগে লাগুক, তারা আপন সন্তানকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চান, পরিবারের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান।

জায়িদ কে? জায়িদ একজন ক্রীতদাস মাত্র। তাকে উকাজের বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছিলো বাড়ির কাজ করার জন্য। কিন্তু বাস্তবিকই জায়িদ কি একজন ক্রীতদাস কেবল? জায়িদ নিজেকে কি তা-ই মনে করেন? আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কি তাকে ক্রীতদাস হিসেবে দেখেন? নাকি আপন সন্তানের মতোই বুকে আগলে রাখেন তাকে?

সন্তানসম স্নেহ দিয়ে এতো বছর ধরে লালন-পালন করা জায়িদকে হারানোর বেদনায় নবির হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু সত্যপথের অগ্রপথিক তিনি, মানবতার মুক্তির জন্য খোদার মনোনীত তিনি, তিনি কি ক্ষণিক আবেগের বশে অন্যায় করতে পারেন? না, তিনি তা করেননি।

যখন ছোট্ট জায়িদ নবিগৃহে প্রথম এসেছিলেন, তখন তিনি নাবালক। এখন তিনি পূর্ণ যুবক। নিজের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে সক্ষম। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট বক্তব্য– 'জায়িদকে অধিকার দেওয়া হোক! সে যদি তোমাদের সাথে চলে যেতে সম্মত হয়, তাহলে আমার পক্ষ থেকে সে মুক্ত। এর জন্য মুক্তিপণেরও প্রয়োজন নেই। আর যদি সে যেতে অসম্মত হয়, তাহলে আমি তার সম্মতির বাইরে নই।'

এমন সহজ শর্তে রাজি না হয়ে হারিসার উপায় ছিলো না। এ তো অত্যন্ত চমৎকার বিচার। ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা। ছেলে যদি তার পিতার কাছে চলে যেতে চায়, তাহলে তার পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাকে মুক্ত স্বাধীন করে দেয়া হবে দাসত্ব থেকে। তা-ও কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত। হারিসা অপেক্ষা করতে লাগলেন পুত্রের জন্য।

জায়িদকে ভেতর হতে ডেকে আনা হলো। এতো বছর পরে পিতা-পুত্রের অশ্রুসিক্ত মিলনে উপস্থিত অন্যদের হৃদয়ও আর্দ্র করে তুললো।

পিতা ও পিতৃব্য হিসেবে হারিসা ও কাআবকে জায়িদ শনাক্ত করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার সামনে মুক্তির দরজা খুলে দিলেন। আত্মীয়-পরিজনের সাথে স্বাধীন জীবনযাপন অথবা তার সান্নিধ্য– যেকোনো একটি বেছে নেবার স্বাধীনতা দিলেন।

জায়িদের চোখভরা জল। শব্দহীন অশ্রুসিক্ত নতশির জায়িদ। কান্নায় চোখ তুলে তাকাতে পারছেন না।

অনেক আশায় বুক বেঁধে দুই হাত বাড়িয়ে থাকা পিতা হারিসা।

আর প্রশান্তচিত্তে অপেক্ষমাণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

মহাকালের পৃথিবীতে ক্ষণিক স্থির যেন সময়ের ঘড়ি।

জায়িদ কোনো কথা বলতে পারছেন না। এ ছিলো জায়িদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। পিতা-মাতা সন্তানের সুদীর্ঘ সময়ের বিচ্ছেদ বেদনার পর আনন্দের মিলন আর পিতৃ-মাতৃহীন জীবনে সদয় আশ্রয়দাতা এবং নতুন আদর্শের দীক্ষাগুরুর সার্বক্ষণিক সাহচর্যের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়া দুরূহ বৈকি! সবাই তাকিয়ে আছে জায়িদের দিকে।

কিছুক্ষণ পর মাথা তুললেন ক্রীতদাস জায়িদ। দু'চোখে তখনো অশ্রুর ঢল। কিন্তু ভাষা সংযত, কণ্ঠ স্থির– 'হে মক্কার শ্রেষ্ঠ মানব! আমি আপনার মোকাবেলায় অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না। আমার মাতা-পিতা এবং আত্মীয়স্বজনের তুলনায় আপনি আমার কাছে অধিক কাম্য। তাই আমি আপনার সান্নিধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।'

কী বললেন তরুণ জায়িদ! এ কি সেই জায়িদ নয়, যে একদিন মাতৃক্রোড় থেকে অপহৃত হয়েছিলো? এ কি সেই জায়িদ নয়, যে পিতার কাঁধে চড়ে হেসেখেলে বড় হয়েছিলো? পিতা হারিসা বাকরুদ্ধ, চাচা কাআব কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্ববৎ প্রশান্ত।

এ কেমন ভালোবাসার বন্ধন, কেমন স্নেহের ডোরে বাঁধা মমতার মায়াজাল– পিতার ভাবনায় আসে না! নাকি এতো বছরের দাসত্বের জীবনে জায়িদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে! পরিবার-পরিজন, পিতা-মাতার

নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে কে আবার দাসত্বের জীবনকে বরণ করে নেয়। প্রশ্ন করেন পুত্রকে।

বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত জায়িদ রক্তের সম্পর্কের ওপরে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে সম্পর্ককে প্রাধান্য দিলেন আর জানিয়ে দিলেন– এ সিদ্ধান্ত তিনি স্থির মস্তিষ্কেই গ্রহণ করেছেন।

জায়িদের বক্তব্যকে পিতা-পিতৃব্য বুকে কষ্ট চেপে মেনে নিলেও এবার আল্লাহর নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অশান্ত হয়ে উঠলেন। ক্রীতদাস জায়িদের হাত চেপে ধরে সোজা চলে এলেন কাবার প্রাঙ্গণে।

এর পরের ঘটনা তো ইতিহাস। ইতিহাস বড় আদর করে এ ঘটনা বিবৃত করেছে নিজের কালো হরফে, যেখানে ইতিহাসের আর সকল উপমা স্থবির।

স্থিরচিত্তে দাসত্বকে বরণ করে নেয়া জায়িদ মুক্তি তো পেলেনই, সেই সাথে মক্কার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির পুত্র হিসেবে গৃহীত হলেন। রাসুলের সাহাবিদের মাঝেও সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

তিনি পরিচিত হলেন জায়িদ ইবনে হারিসা নামে। ইতিহাসে অঙ্কিত হয়ে রইলো তার নাম। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে খলিফা জায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র উসামা ইবনে জায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাষ্ট্রীয় ভাতা স্বীয় পুত্র প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাইতে বেশি নির্ধারণ করেন। এতে আবদুল্লাহ আপত্তি জানান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এই বলে চুপ করিয়ে দেন যে, ‘উসামা আল্লাহর রাসুলের কাছে তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন আর তার পিতাও আল্লাহর রাসুলের কাছে তোমার পিতার চেয়ে প্রিয় ছিলেন।’

এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ করে যান।

শেষ সম্রাট

দ্রোহের স্মরণ

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ সাল। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি।

সিপাহি বিদ্রোহ শেষ হয়ে গিয়েছে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখল থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে সিপাহি-জনতার সম্মিলিত যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিলো তিন-চার মাস ধরে, চার দিন আগে ইংরেজদের দিল্লি পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে সে বিদ্রোহের ইতি ঘটেছে। যেসব সিপাহি, আলেম, সাধারণ জনতা এক হয়ে অস্ত্র ধরেছিলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে, তাদের অধিকাংশই হয়তো শহিদ হয়েছে নয়তো পালিয়ে গেছে দূর-দূরান্তে।

বিদ্রোহ শুরুর সময় পর্যন্ত দিল্লির নামমাত্র শাসক ছিলেন শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। তিনি ইংরেজদের ভয়ভীতি দূরে সরিয়ে সিপাহি বিদ্রোহে মদদ দিয়েছিলেন বিদ্রোহী জনতাকে। যেসব সিপাহি অযোধ্যা, আম্বালা, কানপুর, বাঙ্গালা, ঝাঁসি, বহরমপুর, লক্ষ্ণৌ থেকে স্বাধীনতার আওয়াজ তুলেছিলো, তিনি তাদের সমর্থন দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে নিজেকে স্বাধীন সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন হটিয়ে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের আজাদির।

কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি অবশেষে। মাতৃভূমির প্রতি নিজেদের মমত্ববোধ ভুলে গিয়ে ভারতের মারাঠা, শিখ এবং আরো কয়েকটি জাতি

ইংরেজদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সামান্য অর্থ ও ক্ষমতার লোভে তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয় ইংরেজদের হাতে। ফলশ্রুতিতে ইংরেজরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ সরঞ্জামসহ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিকামী সিপাহি-জনতার ওপর। শুরু করে নির্মম গণহত্যা।

বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিলো রাজধানী দিল্লিতে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের শাহি প্রাসাদ লালকেল্লা। এখানেই একত্রিত হয়েছিলো সারা দেশের বিদ্রোহী নেতারা। সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের অনেক শাহজাদা ছিলেন এ বিদ্রোহের অন্যতম সেনাপতি ও নেতা। সম্রাটের ২২ জন ছেলের মধ্যে ১৮ জনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নেন এ আজাদি আন্দোলনে।

ইংরেজরা দিল্লি দখলের জন্য শহরজুড়ে গণহত্যা শুরু করার পর শহরের এমন কোনো রাস্তা ছিলো না, যেখানে লাশ পাওয়া যায়নি। প্রতিটি রাস্তা, অলি-গলিতে কেবল লাশ আর লাশ। বিদ্রোহী সিপাহি তো বটেই, সাধারণ মানুষকেও তারা ছাড় দেয়নি। বিশেষত আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ছিলো তাদের প্রধান নিশানা। কেননা ইংরেজদের উৎখাত করতে দিল্লির আলেমরাই সিপাহি বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ কারণে ইংরেজদের আক্রোশ ছিলো মুসলিমদের প্রতি।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ তারিখে পুরো শহর দখল করে ইংরেজরা লালকেল্লাও দখল করে নেয়। সেখান থেকে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে গ্রেফতার করে বাহাদুর শাহ জাফরের শাহজাদাদের, যারা তখনো যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো ভারতের মুক্তির জন্য। লালকেল্লা থেকে শাহজাদাদের গ্রেফতার করলেও সম্রাটকে পাওয়া যায়নি লালকেল্লায়। সম্রাট লালকেল্লা থেকে পালিয়ে একটু দূরে অবস্থিত প্রয়াত সম্রাট হুমায়ুনের মাজারের একটি গোপন কুঠুরিতে আত্মগোপন করেন। সঙ্গে ছিলেন তার দুই স্ত্রী ও এক শাহজাদা। ইচ্ছা ছিলো– কিছুদিন এখানে বন্দী থাকার পর পরিস্থিতি শান্ত হলে তিনি পালিয়ে লক্ষ্ণৌ বা বাঙ্গালা যাবেন, সেখান থেকে আবার ঘোষণা দেবেন স্বাধীনতার।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! ২০ সেপ্টেম্বর রাতে হুমায়ুনের মাজারের এক খাদেম অর্থের লোভে সম্রাটের অবস্থান ইংরেজদের জানিয়ে দেয়। ২১ সেপ্টেম্বর সকাল হতেই ইংরেজ ক্যাপ্টেন ডেভিস হাডসনের নেতৃত্বে কয়েকশো ইংরেজ ও মারাঠা সিপাহি পুরো মাজার ঘিরে ফেলে এবং সম্রাটকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলে। যদি বের হয়ে না আসে, তাহলে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে তার শাহজাদাদের।

বেদনার গল্প

'আপনি যাবেন না! ওরা আপনাকে দেখামাত্র গুলি করবে।'

সম্রাটের বেগম জিনাত মহল আবারও নিষেধ করলেন সম্রাটকে। কোর্তার বোতাম লাগাতে গিয়ে থমকে গেলো সম্রাটের হাতের আঙুল। একবার তাকালেন জিনাত মহলের মুখের দিকে। গত কয়েক দিনের শোক আর শঙ্কা তার জ্বলজ্বলে মুখটাকে ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়েছে। তিনি এগিয়ে এসে মাথায় হাত রাখলেন জিনাত মহলের।

'আমাকে যেতেই হবে, জিনাত। আমরা ধরা পড়ে গেছি। শত্রুরা জেনে গেছে আমাদের অবস্থান। আমি যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করি, তবে ইংরেজরা এখান থেকে অসম্মানের সঙ্গে টেনেহিঁচড়ে বের করবে আমাদের। আমি জীবিত থাকতে আমার পরিবারের কাউকে চোখের সামনে বেইজ্জতি হতে দেবো না। আমার ২২ ছেলের ১৮ জনই হয়তো ওদের হাতে শহিদ হয়েছে নয়তো বন্দী হয়েছে। আমি আত্মসমর্পণ করলে ওদের হয়তো ছেড়ে দেবে। আমার জীবনদানে যদি ওদের জীবন বাঁচে... আমাকে আর নিষেধ কোরো না, জিনাত! এই হিন্দুস্তানের জন্য তো কিছুই করতে পারিনি আমি। পরাধীন এক জীবন শুধু বয়ে বেড়িয়েছি। জীবনের শেষে এসে না হয় এই আত্মদান করে যাই। বিজেতা না হই, ইতিহাসে আমার নাম লেখা হোক শহিদ সম্রাট নামে।'

সম্রাটের কথায় হু হু করে কেঁদে ফেললেন জিনাত মহল। সম্রাট সমস্ত শাহি লেহাজ ভুলে গিয়ে বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধির এই গোপন কুঠুরিতে জড়িয়ে ধরলেন জিনাত মহলকে। একটু দূরে দাঁড়ানো আরেক

বেগম আশরাফ মহলও নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনিও হাউমাউ করে এগিয়ে এসে জাপটে ধরলেন বৃদ্ধ সম্রাটকে। কুঠুরির নির্মম দেয়াল কেবল গুমরে ওঠা কান্নার প্রতিধ্বনি দিয়েই সান্ত্বনা দিতে পারলো।

এমন অভাবনীয় কান্নাভেজা ভালোবাসা সম্রাট তার অশীতিপর জীবনে কোনো দিন পাননি। প্রাসাদ আর হেরেমের রুটিনবদ্ধ জীবন তাকে এমন বাঁধভাঙা কান্নার অশ্রুজল, এই বেদনামুখর বিচ্ছেদ উপহার দেয়নি কখনো। আহ! এমন বেদনায় ভেসে যদি আর কটা দিন বাঁচা যেতো! সম্রাটের হৃদয়ে বিরহ উপচে এলো।

একটু পর।

ইংরেজদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হুমায়ুনের সমাধিমহল থেকে বেরিয়ে এলেন ভারতবর্ষের শেষ মুঘলসম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। ভারতের স্বাধীনতার শেষ পরাধীন সূর্য। শেষ বিদ্রোহী সম্রাট। যার হাতে হাত রেখে কদিন আগেই অযোধ্যা, আম্বালা, কানপুর, বাঙ্গালা, ঝাঁসি, বহরমপুর, লক্ষ্মৌর স্বাধীনতাকামী সিপাহিরা শ্লোগান তুলেছিলো– খালকে খোদা, মুলকে বাদশাহ, হুকুমে সিপাহি। আর তিনি নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন দিল্লির স্বাধীন সুলতান। তারপর সব ইতিহাস!

খুনের শহরে

'মিস্টার জাফর! আপনি আমাদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ।' মুখে ক্রূর হাসি টেনে বললেন ইংরেজ ক্যাপ্টেন ডেভিস হাডসন। দিল্লির ইংরেজ বাহিনীতে যাকে 'চোখা কসাই' বলে ডাকা হয়।

'আমার সঙ্গে এখন কী করা হবে?'

সম্রাট কোনো ধরনের সৌজন্য না দেখিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন। যে পরিস্থিতিতে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন, তাতে সৌজন্য বলতে আর কিছু থাকে না। এখনো তিনি জানেন না গতকালের ধ্বংসযজ্ঞের পর কোথায় আছে তার সন্তানেরা। জামে মসজিদের চারপাশে, উর্দু বাজার,

রোশনপুরা মালিওয়ারা, ছিপ্পিওয়াড়ার দিকে কাল পালিয়ে গিয়েছিলো তারা। সবাই কি ধরা পড়েছে? কী আচরণ করা হয়েছে তার জানবাজ সিপাহিদের সঙ্গে?

'আপনি কি দেখতে চান আপনার সঙ্গে কী করা হবে?'

সম্রাট তাকালেন ক্যাপ্টেন হাডসনের দিকে। ঠিক একজন কসাইয়ের মতোই লাগছে তাকে। লাল টকটকে হয়ে আছে তার চোখ-মুখ। আবার হুঙ্কার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন– 'সিপাহি! সম্রাটের উপহার নিয়ে আয়!'

একটা গিলাফঢাকা তশতরি নিয়ে এগিয়ে এলো এক মারাঠা সিপাহি। মারাঠারা সব সময় সঙ্গ দিয়েছে ইংরেজদের। বিদ্রোহের পর দিল্লিতে ইংরেজদের আবার বিজয়ী করতে মারাঠাদের অবদান সবচেয়ে বেশি।

সিপাহি তশতরিটি রাখলো সম্রাট এবং ক্যাপ্টেনের পায়ের সামনে। ক্যাপ্টেন একটানে সরিয়ে ফেললেন তশতরি ঢেকে রাখা কালো রঙের গিলাফটি। গিলাফ সরাতেই সম্রাট দেখলেন তার আদরের তিন ছেলের কাটা মাথা সাজানো আছে তশতরিতে...।

রিক্তের বেদন

দিল্লির বিখ্যাত ইন্ডিয়া গেটের সামনে 'খুনি দরজা' নামে একটি দরজা আজও আছে। যেখানে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয় মির্জা মুঘল, মির্জা খিজির সুলতান, মির্জা আবু বকরসহ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের ১৮ জন ছেলেকে। তাদের সঙ্গে অসংখ্য সিপাহি, আলেম, স্বাধীনতাকামী মানুষকেও নির্দয়ভাবে খুন করা হয়। পুরো লালকেল্লার আঙিনা, সামনের রাস্তা রক্তের নদী হয়ে গিয়েছিলো সেদিন। সেই থেকে এই দরজার নাম হয়ে যায় 'খুনি দরজা'।

এই ঘটনার পর ৮২ বছর বয়স্ক সম্রাট বাহাদুর শাহকে নির্বাসনে পাঠানো হয় তৎকালীন বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে। সেখানেই তিনি ১৮৬২ সালের ৭ নভেম্বর ৮৭ বছর বয়সে অত্যন্ত নিগৃহীতভাবে মৃত্যুবরণ

করেন। তাকে যে বাড়িতে রাখা হয়েছিলো, সে বাড়িরই পেছনে মামুলি একটা কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরও ইংরেজরা কাউকে জানতে দেয়নি তার কবরটি ঠিক কোথায়, যাতে মানুষ তাদের সম্রাটকে শ্রদ্ধা জানাতে না পারে।

সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর অত্যন্ত উমদাহ কবি ছিলেন। উর্দুকবি গালিব ছিলেন তার দরবারি কবি। বেশ বন্ধুত্ব ছিলো দুজনের।

নির্বাসনের দিনগুলোতে সম্রাট অনেক কবিতা লেখেন। তার মধ্যে বিখ্যাত হলো, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে লিখেছিলেন–

উমরে দারাজ মাঙ্গ কার লায়ি থি চার দিন
দো আরজু মে কাট গায়ে, দো ইন্তেজার মে
কিতনা হ্যায় বদনসিব জাফর, দাফন কে লিয়ে
দো গজ জমিন ভি না মিলি কোয়ে-ইয়ার মে

তরজমা

দীর্ঘ জীবন কামনা করে পেয়েছিলাম যে চারটে দিন
দুদিন গিয়েছে প্রতীক্ষায় তার আর দুদিন গেলো অপেক্ষায়
এমনই অভাগা এই জাফর, তাকে দাফনের জন্য
দু' গজ জায়গা মেলেনি স্বজন-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার কবরখানায়

ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আশির দশকে বার্মা সফরে গেলে তিনি যান বাদশাহ জাফরের মাজার পরিদর্শনে। সেখানে তিনি কবিসম্রাটের এই কবিতা পড়ে পরিদর্শন বইয়ে লেখেন–

'দো গজ জমিন তো না মিলি হিন্দুস্তান মে, পার তেরি কোরবানি সে উঠি আজাদি কি আওয়াজ, বদনসিব তু নাহি জাফর, জুড়া হ্যায় তেরা নাম ভারত শান আউর শওকত মে, আজাদি কি পয়গাম সে।'

–'হিন্দুস্তানে তুমি দু' গজ মাটি পাওনি সত্য, তবে তোমার আত্মত্যাগ থেকেই আমাদের স্বাধীনতার আওয়াজ উঠেছিলো একদিন। দুর্ভাগ্য তোমার নয় জাফর, স্বাধীনতার আগমনীধ্বনির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সুনাম ও গৌরবের সঙ্গে তোমার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।'

ভিনদেশি

গ্রামের নাম সানিয়্যা

এ বসতির একটা নাম আছে– সানিয়্যা। বসরা থেকে শ' পাঁচেক মাইল দূরের এক জনবসতি। বসরার এ অঞ্চলের পুরোটাই প্রায় মরুময় হলেও সানিয়্যা এলাকাটি বেশ সবুজ শ্যামলে ছাওয়া। খেজুর বাগান তো বটেই, বসতির চাষিরা মৌসুমে আঙুর, যব আর গমের আবাদও করে পাশের জমিগুলোতে। এছাড়া জয়তুন গাছ প্রায় ছেয়ে আছে পুরোটা এলাকায়। আছে হরেক রকম ফুলের বাগানও। বসরার গোলাপ বলে বিখ্যাত যে প্রবাদ, সে গোলাপের চাষ এখানে না হলেও নার্গিস, অর্কিড, বাগানবিলাস, বিভিন্ন রঙের ঘাসফুলে মাতোয়ারা পুরো সানিয়্যা।

বসতির দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে চলেছে একটি শান্তশিষ্ট পাহাড়ি নদী। পাহাড়ি নদী বলে এর জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ আর স্বাদু। কুলকুল শব্দে বয়ে চলা ঝরনানদীর স্রোতের দিকে তাকালে নিচের পাথুরে জমিন স্পষ্ট নজরে আসে, যেন স্বচ্ছ কাচের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে সলীলা স্রোত।

বসতির পাশে না হলেও পাহাড় খুব একটা দূরে নয় সানিয়্যা থেকে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকালে সহজেই চোখে পড়ে পাহাড়শ্রেণি। গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একেকটা পাহাড়। পাহাড়ের এ গাম্ভীর্যতার কারণেই এলাকাবাসীও কেন যেন দারুণ ভয় পায় দূরের পাহাড়গুলোকে। বসতিবাসী বড় একটা যায় না পাহাড়ের দিকে।

বসতিবাসীর ভয় পাওয়ার বড় একটা কারণ অবশ্য আছে। ওই পাহাড়ের ওপারেই রোম সাম্রাজ্য। রোমীয় বাহিনীর বড় একটি ফৌজি ঘাঁটিও আছে পাহাড়ের ওপাশে। কখন না কখন তারা হামলা করে বসে, সেই ভয় তাদের মনের মধ্যে সব সময়ই বাসা বেঁধে থাকে। কেননা ইরাকের অন্যান্য শহর ও বসতির মতো সানিয়্যাও পারস্য সম্রাটের অধীন। এ কারণে রোম-পারস্য যুদ্ধ জড়িয়ে পড়লে তার ঢেউ যে এখানে লাগবে না– এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।

সানিয়্যা এমনিতে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো এলাকা না হলেও এর সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। ইরাকের বিভিন্ন শহরের বিত্তবান লোকজন আমোদ-প্রমোদের জন্য বছরে দু-একবার এখানে চলে আসেন। বিশেষত বছরের এ সময়টা অবকাশ যাপনের জন্য সবচেয়ে আরামদায়ক। মৌসুম শুরু হতে হতে ইতোমধ্যেই কিছু পরিবার চলে এসেছে। তাদের মধ্যে বসরার কাছে 'উবুল্লা' নামের একটি সমৃদ্ধ নগরীর গভর্নর সিনান নুমাইরির পরিবারও রয়েছে।

সিনান নুমাইরি প্রশাসনিক ঝামেলা সামলাতে সামলাতে অবকাশযাপনে আসতে পারেননি পরিবারের সঙ্গে। রোমের সম্রাটের সঙ্গে এ মুহূর্তে পারস্য সম্রাটের বনিবনা হচ্ছে না মোটেই। দুই দেশের রাজধানী থেকেই নানা কথা শোনা যাচ্ছে। যেকোনো মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। এ কারণে স্ত্রী সালমা বিনতে কায়িদ আর পাঁচ বছর বয়সী একমাত্র ছেলে সুহাইবকে প্রয়োজনীয় লোক-লশকরসহ পাঠিয়ে দিয়েছেন সানিয়্যায়। কথা দিয়েছেন– প্রশাসনিক ঝামেলা সামলে তিনি দু-তিন দিন পরই চলে আসবেন। বাদবাকি খোদার মর্জি!

বিদায়, মা

রাতে সানিয়্যা পল্লির ওপর অতর্কিত হামলা হলো।

রোমীয় সৈন্যরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নেমে প্রথমেই আগুন ধরিয়ে দেয় বসতির ঘর আর আস্তাবলগুলোতে। তারপর চালাতে থাকে লুটতরাজ। সামনে যাকে পেলো তাকেই হত্যা করলো। বসতির বিশ-

পঁচিশ জন প্রহরী যারা ছিলো তাদের অনেকেই দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলো। বাদবাকি কয়েকজন প্রতিরোধের চেষ্টা বৃথা দেখে হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করলো।

প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ধন-সম্পদ যা পেলো সব লুটে নিলো রোমীয়রা। পুরুষরা অধিকাংশই নিহত হয়েছে, নয়তো পালিয়ে গেছে। নারী ও শিশু যাদের পেলো, তাদের বন্দী করা হলো।

বসতিতে হামলা শুরু হতেই সালমা বিনতে কায়িদ ছেলে সুহাইবকে বুকে আগলে নিয়ে ঘরের এক কোণে লুকিয়ে ছিলেন। রোমানরা ঘরে আসতেই শিশু সুহাইব ভয় পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। রোমানরা তাদের দেখতে পেয়ে দুর্জনকেই ধরে নিয়ে গেলো।

রোমানরা নারী ও শিশুদের ওপর হামলা না করলেও তাদের সঙ্গে বড় একটা ভালো ব্যবহার করতো না। নারী ও শিশুদের বন্দী করে তারা তাদের বিক্রি করে দিতো দাসবাজারে।

দিনের আলো ফোটার আগেই রোমানরা সানিয়্যা থেকে বন্দী করে নিয়ে আসা নারী ও শিশুদের দুটো আলাদা দলে ভাগ করে রোমের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। এক দলে নারী, অপর দলে কমবয়সী শিশুরা।

বন্দী হওয়া নারীদের দলটিতে ছিলেন সালমা। তিনি রোমান সৈন্যদের হাতে-পায়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'ওই শিশুদের দলে আমার পাঁচ বছর বয়সী ছেলে আছে। আমাকে না পেয়ে সে দিশেহারা হয়ে কাঁদছে। দয়া করে তাকে আমার কাছে এনে দাও, নয়তো একটিবারের জন্য আমাকে যেতে দাও তার কাছে।'

তার কথায় রোমান সৈন্যদের দিল মোটেও নরম হলো না। পারসিকদের তারা পশুর চেয়েও ঘৃণা করে। তাদের ব্যাপারে তাদের অন্ত রে কোনো দয়ামায়া নেই। যুগ যুগ ধরে রোম আর পারস্য সাম্রাজ্যের মাঝে জারি রয়েছে যে জাতিগত লড়াই, এ ঘৃণা সে লড়াইয়েরই বিষফল। দুটো জাতির মাঝে তুলে রেখেছে শুধু ঘৃণা আর শত্রুতার দেয়াল। এর বাইরে আর কিছু ভাববার অবকাশ নেই তাদের।

রোমান ফৌজি চৌকিতে নিয়ে আসা হলো পারস্যের বন্দীদের। বন্দীদের সবার হাতে-পায়ে শেকল বা দড়ি বাঁধা। এখানে এনে তাদের

পেশ করা হলো ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তার সামনে। এতোগুলো নারী ও শিশু দেখে তার চোখ লোভে চকচক করে উঠলো। বাজারে বিক্রি করে দিলে পাওয়া যাবে অনেক নগদ আশরফি। সিপাহিদের তখনই হুকুম দিলেন নারীদের দলটিকে মার্ভের বাজারে নিয়ে যেতে, আর শিশুদের দলটিকে মাদায়েনের বাজারে নিয়ে যেতে। কেননা বাজারভেদে দাসের বাজার একেক রকম। সেটা বুঝেই তিনি দুই দলকে দুটো আলাদা বাজারে নিয়ে যেতে বললেন।

সালমা দেখলেন, তার ছেলেকে নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ানো হলো। তার সঙ্গে আরো অনেক শিশু। তিনি চিৎকার করে ছেলের নাম ধরে ডাকলেন। ছেলে সুহাইব মায়ের ডাকে চোখ তুলে তাকালো। দেখলো, তার মাকে একটা থামের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে ছেলেকে ডাকছেন। সুহাইবও মাকে দেখে মা... মা... বলে চিৎকার করে উঠলো।

এতে রোমান সৈন্যদের মনে কোনো ভাবান্তর হলো না। তারা বরং বিরক্তই হলো। যারা শিশুদের নিয়ে গাড়িতে তুলছিলো, তারা সবাইকে উঠিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলো। শিশু সুহাইব চিৎকার করছিলো দেখে ঠাস করে তার গালে একটা চড় মেরে গাড়ির মেঝেতে ফেলে দেয়া হলো। অন্য শিশুদেরও চিৎকার করতে নিষেধ করে কোচোয়ান গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেলো।

ছেলেকে চলে যেতে দেখে সালমা পাগলিনীর মতো বুক চাপড়াতে লাগলেন। সর্বসাধ্য দিয়ে লোহার শেকল ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। লোহার শেকল ছিঁড়লো না, বরং হাতের কবজিতে শেকলের কবজাগুলো বসে গেলো। চামড়া ফেটে রক্ত গড়াতে লাগলো। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজেকে মুক্ত করতে তিনি দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগলেন লোহার শেকল।

কিছুতেই কিছু হলো না। তাকিয়ে দেখলেন, ছেলেকে নিয়ে যাওয়া গাড়িটি দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। একটু পরই চোখের আড়াল হয়ে যাবে। তার মনে হলো, এ জীবনে আর কোনো দিন তিনি ছেলের দেখা পাবেন না। ছেলের মুখটা দু'হাতে তুলে আর কোনো দিন আদর করতে

পারবেন না। সালমা অক্ষম আক্রোশে গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুললেন।

হঠাৎ তার পিঠে স্যাঁৎ করে চাবুকের বাড়ি পড়লো। কয়েকটা বাড়ি পড়তেই পিঠ দিয়ে দরদর করে রক্ত গড়াতে লাগলো। একটু পরই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সালমা। তার নির্জীব দেহটা পড়ে রইলো রক্ত আর ধুলোয় গড়াগড়ি করে।

কালকের গভর্নরের প্রিয়তম স্ত্রী আজ ক্রীতদাসী হিসেবে শেকলবন্দী হয়ে পড়ে আছেন মাঠের ধুলোয়। কালকের মমতাময়ী মা আজ রক্তাক্ত দেহ নিয়ে চিরদিনের জন্য বিদায় দিলেন নিজের নাড়িছেঁড়া সন্তানকে।

মা ও ছেলের দেখা হয়নি এ জীবনে কোনোদিন আর।

ভবিষ্যদ্বাণী

সুহাইব ইবনে সিনান।
বসরার সুহাইব। বছর পাঁচেকের সুহাইব।
বিক্রি হয়ে গেলেন মাদায়েনের দাসবাজারে।
তার মুনিব তাকে নিয়ে গেলো সিরিন।
আবার বিক্রি হলেন। নতুন মুনিব নিয়ে গেলো হিরায়।
কিছুদিন পর বিক্রি হলেন আরেক মুনিবের কাছে।
তিনি তাকে নিয়ে গেলেন নিজ শহর মার্ভে।
সেখান থেকে আরেক মুনিব, তারপর আরেকজন।
সুহাইব রোমের শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দাস হিসেবে।
শৈশব পেরিয়ে কৈশোর, কৈশোর থেকে তারুণ্য, তারুণ্য থেকে হয়ে উঠলেন পরিপূর্ণ যুবক।
ভুলে গেলেন মাতৃভাষা আরবি।
ভুলে গেলেন আরবের সংস্কৃতি। ভুলে গেলেন মাতৃভূমির পথ।
ভুলে গেলেন সেই বসরা। সেই আঙুর বাগানের শৈশব।
শুধু মনে রইলো মায়ের মুখটা।
চিৎকার করতে থাকা বেদনায় লীন হওয়া মায়ের মুখচ্ছবি।

পিতার আদর। ভালোবাসার ছোট্ট একটা গৃহকোণ।

আর মনে রইলো একদা তিনি আরব ছিলেন।

***

সুহাইব ইবনে সিনান এখন রোমের রাজধানীতে। বয়সে পরিপূর্ণ যুবক। কাজ করেন এক আমিরের বাড়িতে। ক্রীতদাস হিসেবে প্রায় পনেরো বছর কাটিয়ে দিয়েছেন রোমের বিভিন্ন শহরে।

নিজের অতীত খুব একটা মনে পড়ে না এখন তার। বসরার স্মৃতিগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে মন থেকে। তবে মনের মধ্যে সব সময় বাজে– আমি আরব। আমাকে একদিন আরবে ফিরে যেতে হবে। আরবদের মতো হতে তিনি যে মুনিবের বাড়িতেই থেকেছেন সেখানেই কিছু-না-কিছু যুদ্ধবিদ্যা শিখে নিয়েছেন। বিশেষ করে তিরন্দাজিতে তার দক্ষতা ছিলো প্রবাদতুল্য। আকাশে উড়ন্ত পাখিকে তিনি তিরের আঘাতে নিমিষেই পেড়ে ফেলতে পারতেন।

সুহাইব ক্রীতদাস হিসেবে রোমে থাকলেও তার মনের মধ্যে সর্বদা বিরাজ করতো আরবের ভালোবাসা। রোমের বড় বড় শহর আর চাকচিক্যের মাঝে জীবন কাটালেও তার মন পড়ে থাকতো আরবের মরুতে টাঙানো তাঁবুর মধ্যে। সেই খর্জুরবীথিকা, সেই বালুময় বসতি, সেই দুরন্ত যাযাবর জীবন তার অবচেতন মনে গেঁথে থাকে। আরবের দুর্লঙ্ঘ আকর্ষণ তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন না। শুধু প্রতীক্ষা করেন– কবে তিনি পালাতে পারবেন পারস্যের এই লৌকিক সভ্যতা থেকে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

একদিন বাজার থেকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন এক জায়গায় কিছু মানুষের জটলা। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলেন। এক খৃস্টান কাহিন (ভবিষ্যদ্বক্তা) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে তার ধর্ম প্রচার করছিলো।

রাষ্ট্রীয়ভাবে খৃস্টধর্ম রোমে বিধিবদ্ধ নয়। এ ধর্মের অনুসারী বা প্রচারকদের পেলে সরকারি পেয়াদারা নানাভাবে হেনস্থা করে থাকে। রোমানরা আগুন বা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। এর বাইরে

অন্য কোনো ধর্ম বরদাশত করতে তারা রাজি নয়। এ কারণে খৃস্টানরা লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের ধর্ম প্রচার করে।

সুহাইবের খৃস্টধর্ম বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ নেই। তার আসলে কোনো ধর্মের প্রতিই আকর্ষণ নেই। না রোমীয়দের আগুন পূজা, না খৃস্টধর্মের অলীক আরাধনা। তিনি এসবের মাঝে কোনো প্রাণ খুঁজে পান না। আর তিনি নিজেও জানেন না ছোটবেলায় তার পিতা-মাতার ধর্ম কী ছিলো। এ কারণে ধর্মপালনে তার তেমন বাধ্যবাধকতাও নেই। শুধু রাতে একা থাকেন যখন, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবেন– যে এতো লক্ষ-কোটি নক্ষত্র সৃজন করলো, কে সে?

তিনি জটলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় খৃস্টান কাহিন বলে উঠলো– 'সে সময় প্রত্যাগত, যখন জাজিরাতুল আরবের মক্কায় একজন নবি আসবেন। যিনি হবেন শেষ নবি। তিনি ঈসা ইবনে মরিয়মের ধর্মকে সত্যায়িত করবেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আহ্বান করবেন।'

আরবের কথা শোনামাত্রই সুহাইব থমকে দাঁড়ালেন। আরবে একজন নবি আসবেন? শেষ নবি? তিনি মক্কায় আসবেন? সুহাইব কাহিনকে আবার বলতে বললেন কথাটা। কাহিন আবার বললো। সুহাইবের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেলো কথাটা আবার শোনার পর। অবশেষে তাহলে আরবেই নবি আসবেন? আমার আরবে?

তবে কি আমার ডাক এসেছে আরব থেকে?

মক্কায়, নবির শহরে

সুহাইব ফিরে এলেন বাজার থেকে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন– যে করেই হোক তাকে পালাতে হবে।

এক রাতে সত্যি সত্যি পালালেন নিজের মুনিবের থেকে। রোমের বিভিন্ন শহর পাড়ি দিয়ে চলে এলেন আরবে। কাহিনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পাড়ি জমালেন মক্কায়।

মক্কায় তিনি আগন্তুক। একদম অচেনা শহর, পথঘাট। এখানকার মানুষজন কাউকেই চেনেন না। কী করবেন, কোথায় থাকবেন তার কোনো বন্দোবস্ত নেই। অবশ্য সঙ্গে করে বেশ কিছু আশরফি নিয়ে এসেছেন তিনি। এ পর্যন্ত রোমে যা আয় করেছিলেন, তার কিছুই খরচ করেননি। সব সঞ্চয় করে রেখেছিলেন।

মক্কার এক লোকের সঙ্গে অবশেষে পরিচয় হলো। তার নাম আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন। লোকটা এমনিতে ব্যবসায়ী। আমানতদার ও অতিথিপরায়ণ হিসেবে তার সুনাম আছে।

সুহাইবকে দেখে আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন প্রথমে মনে করেছিলেন তিনি পারস্য বা রোমের লোক। কেননা সুহাইবের মাথার চুল ছিলো লালচে এবং তার কথার মধ্যে কিছুটা জড়তা ছিলো। যার দরুন তাকে আরব ভাবাটা ছিলো কষ্টকর। তাছাড়া তিনি আরবি ভাষা পুরোটা না হলেও অনেকটা ভুলে গিয়েছিলেন। ভাঙা ভাঙা আরবিতে কথা বলছিলেন।

অবশেষে সুহাইব যখন তার জীবনবৃত্তান্ত খুলে বললেন, তখন আবদুল্লাহ তাকে অভয় দিলেন– 'এ মক্কায় তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার যতোদিন ইচ্ছা তুমি আমার বাড়িতে থাকতে পারো। আজ হতে তুমি আমার ভাই।'

এক দিন গেলো, দুই দিন গেলো, তৃতীয় দিন সুহাইব আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনকে জানালেন, তিনি ব্যবসা করতে আগ্রহী। তার আগ্রহ দেখে আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন খুশি হলেন। নিজের ব্যবসার অংশীদার করে নিলেন।

তায়েফ, দামেস্ক, জেরুসালেমে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করতেন আবদুল্লাহ। নিজের ব্যবসার সঙ্গে এবার সুহাইবকেও অংশীদার করে নেয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসা বেশ চাঙা হয়ে উঠলো। বছর তিনেকের মধ্যে তারা আরবের অন্যতম বড় ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন।

সুহাইব নিজের ব্যবসায়ী সাফল্য নিয়ে বেশ তৃপ্ত। যাক, এবার স্বাধীনভাবে স্বাধীন ব্যবসা করে নিজের জীবনটা সাজিয়ে তোলা যাবে।

কিন্তু এতো সাফল্য, এতো সম্পদ আহরণের পরও সুহাইবের মন থেকে উৎকণ্ঠা কমেনি এক বিন্দুও– কবে আসবেন নবি? তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও নবির জন্য প্রতীক্ষা করতেন। ব্যবসার কাজে দূরে কোথাও গেলে, ফিরে এসেই খবর নিতেন মক্কার– নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না। আশপাশের বসতিগুলোতে খোঁজ করতেন, সেখানে কোনো নতুন কাহিনি সংঘটিত হয়েছে কি না।

এমনই এক সফর থেকে ফিরে এসেছেন মক্কায়। লম্বা সফর ছিলো। অনেক দিন ছিলেন মক্কার বাইরে। মক্কার খবরাখবর এ কয়দিন জানেন না কিছুই। ফিরে এসেই বিভিন্নজনের কাছে জানতে চাইলেন মক্কার হাল-হকিকত।

একজনের কাছে শুনতে পেলেন, মক্কার মুহাম্মদ নামের লোকটি নিজেকে আল্লাহর নবি ঘোষণা করেছেন। তিনি মানুষকে মূর্তিপূজা ছেড়ে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা করার আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি অন্যায় ও অশ্লীলতা ছেড়ে মানুষকে সভ্যতার দিকে ডাকছেন। ন্যায় ও ইনসাফের সমাজ গড়ার কথা বলছেন।

সুহাইব ইবনে সিনানের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেলো। তিনি জলদি লোকটির কাছে জানতে চাইলেন, 'ইনি কি সেই লোক, যাঁকে তাঁর বিশ্বস্ততা আর সত্যবাদিতার জন্য আল-আমিন বলে ডাকা হয়?'

লোকটি বললো, 'হ্যাঁ, ইনিই সেই ব্যক্তি।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর বর্তমান অবস্থান কোথায়? এ মুহূর্তে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

জানানো হলো, 'তিনি আপাতত সাফা পাহাড়ের পাশে আল-আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়িতে অবস্থান করছেন। তবে তুমি যদি সেখানে যেতে চাও, সাবধানে যেও। কেননা কুরাইশরা তাঁর পেছনে লেগে আছে। তারা কাউকে মুহাম্মদের কাছে যেতে দেখলে তার সঙ্গে অত্যন্ত বাজে ব্যবহার করে। তুমি তো ভিনদেশি, তোমার সঙ্গে যদি তারা কোনো অন্যায় আচরণ করে ফেলে, তবে তোমাকে বাঁচানোর মতো

কেউ নেই এখানে। মক্কায় তোমার বংশ-গোত্রের লোকজনও কেউ নেই যে তোমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচাবে।'

সুহাইব ইবনে সিনানের কান দিয়ে এখন আর কিছুই ঢুকছে না। না লোকটির ভবিষ্যদ্বাণী, না তার সাবধানবাণী। তার মাথায় এখন শুধু একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে– মক্কায় অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত নবি এসেছেন! যিনি সত্যায়ন করবেন পূর্ববর্তী সত্য ধর্মের। যিনি মানুষকে নিয়ে যাবেন অন্ধকার থেকে আলোর ঝরনাধারার দিকে। যিনি পরমাত্মার সঙ্গে মানুষের অন্তরাত্মার সম্মিলন ঘটিয়ে দেবেন। তিনি এসেছেন অবশেষে!

সুহাইব পাগলের মতো হাঁটতে লাগলেন। তার কোনো দিকে খেয়াল নেই– কিসের কুরাইশ আর কিসের সাবধানবাণী! আজ তিনি মহাসত্যের সামনে দাঁড়াবেন, তার আজ ভয় কিসের!

পৌঁছে গেলেন আল-আরকামের বাড়ির সামনে। থমকে দাঁড়ালেন একটু। বাড়ির সামনে কেউ একজন দাঁড়ানো আছে। কে? আম্মার? আম্মার ইবনে ইয়াসির?

আম্মারকে আগে থেকেই চিনতেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে, আম্মার নাকি? তুমি এখানে?'

আম্মার ইবনে ইয়াসির পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আমার কথা ছাড়ো, তুমি এখানে কী করছো?'

সুহাইব ইবনে সিনান সোজাসাপ্টা বললেন, 'আমি এ লোকের কিছু কথা শুনতে চাই। তিনি কী কথা বলেন, সে ব্যাপারে একটু জানতে ইচ্ছুক।'

এবার আম্মার ইবনে ইয়াসির বললেন, 'আমিও একই পথের পথিক।'

সুহাইব বললেন, 'তাহলে আর দেরি কেন? চলো, আল্লাহর নাম নিয়ে ভেতরে যাই।' তারা উভয়ে দারুল আরকামে প্রবেশ করলেন।

আলোর বিচ্ছুরণ

সুহাইব ইবনে সিনান এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির।
শুনলেন সেই কণ্ঠস্বর। সেই অবিনশ্বর অমিয়বাণী।
বায়ুপ্রবাহের মতো অনুরণিত। সূর্যকিরণের মতো শাশ্বত।
তারা বিমোহিত হলেন নিটোল সে আওয়াজে।
তারা নীত হলেন। অশ্রুত চোখে বিনীত হলেন।
ইমানের দীপ্তশিখায় অঙ্গার হয়ে খাঁটি সোনা হলেন।
সমর্পিত হলেন। সমর্পণে মাতোয়ারা মানুষ হলেন।
পাঠ করলেন– আশহাদু আল্লা ইলাহা...!

সুহাইব ইবনে সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগে আরো প্রায় ত্রিশ জন ইসলাম গ্রহণ করে স্নাত হয়েছেন রহমত বারিধারায়। তাদের অধিকাংশই কুরাইশদের অত্যাচারের ভয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতে সাহস পাননি। সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু যদিও বিদেশি ছিলেন, মক্কায় তিনি ছিলেন এক ভিনদেশি মাত্র, তবু তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা চেপে রাখলেন না।

যে সত্যের মহার্ঘ্য তিনি বর পেয়েছেন।
অধীর অপেক্ষায় ছিলেন বহুকাল যে ঘোষণা সত্যায়নের জন্য।
যার জন্য ছুটে এসেছেন সুদূর রোম থেকে।
দাসত্বের জিঞ্জির ছুড়ে ফেলে যে সুপ্ত বর্ষণে স্নান করতে চেয়েছেন।
আজ তিনি সেই আলোক রোশনিতে ডুবন্ত।
তিনি আজ পূর্ণ করেছেন তার দিগ্ভ্রান্ত সফর।
বহু বছরের স্বজনহীন কান্না বুকে চেপে রেখেছিলেন।
আজ তিনি কান্নার উপলক্ষ পেলেন।

আজ তিনি হাহাকার উজাড় করে দেবার প্রেমিত অশ্রু উপহার পেলেন।

বুকের সকল ব্যথা উগরে দেবার এক মহামানবের পদযুগল পেলেন।

পেলেন ভালোবাসবার এক গুলে আরব।

আজ কেন তিনি চুপ থাকবেন? কেন ঘরে বসে থাকবেন?

তিনি কাবা চত্বরে ঘোষণা করলেন– মুহাম্মদ সত্য।

ইসলাম সত্য। আল কোরআন সত্য। আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়।

আম্মার, সুমাইয়া, ইয়াসির, খাব্বাব, বেলালের মতো তার ওপরও নেমে এলো নির্যাতনের ভয়ঙ্কর খড়ুগ। তাতে কী আসে যায় তার! তিনি তো সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছিলেন। তিনি তো এক ক্রীতদাস হিসেবে কাটিয়েছেন বহুকাল। তিনি তো সেই বালক, যে নিজের চোখের সামনে সহ্য করেছেন মায়ের রক্তাক্ত মুখ। মায়ের শেষ ডাক শুনেছেন বহু বছর আগে। স্বজন-পরিজনহীন কাটিয়েছেন যুগের পর যুগ। তার তো আর হারাবার কিছু নেই।

আজ তিনি রাসুলে আরাবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার অকূল পাথারে তরি ভাসিয়েছেন। তার প্রেম আজ আল্লাহ্র সঙ্গে। তিনি আজ ভালোবাসার সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পাঞ্জেরি। সকল অত্যাচার, নির্যাতন, অপমান, যাতনা সয়ে যেতে লাগলেন হাসিমুখে। নীরবে অশ্রু সংবরণ করে গেলেন। কোনো অভিযোগ নেই, কোনো অনুযোগ নেই। মুখে কেবল বেলালের আহাদ... আহাদ... ধ্বনি। বরণ করে নিলেন– 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।'

নীড়হারা পাখি

আর কতোদিন সওয়া যায় এ নির্যাতন! রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন হিজরতের। যারা সত্যের সূর্যের আলোকচ্ছটা দেখেও অন্ধকারে ঘুরে মরে, যারা নবুয়তের দীপ্ত রশ্মিকে চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়– হেদায়েতের সরল পথ তাদের অধরাই থাকুক একালে।

সাহাবারা হিজরত করে চলে গেলেন আবিসিনিয়াসহ বিভিন্ন দেশে। সুহাইব ইবনে সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু কোথাও গেলেন না। তিনি মক্কায়ই রয়ে গেলেন। মনের বাসনা ছিলো, তিনি সালেসু সালাসা–তিনজনের তৃতীয়জন হবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি

ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তিনি। তিনজন একসঙ্গে মদিনায় হিজরত করবেন।

কিন্তু কুরাইশরা তার বাড়ির চারপাশে কড়া পাহারা দিয়ে রেখেছিলো। এ কারণে তিনি মদিনায় হিজরতের সময় রাসুল ও আবু বকরের সঙ্গী হতে পারেননি।

তিনি ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। অনেক ধন-সম্পদ ছিলো তার। এ কারণে মক্কার কাফেররা তাকে মক্কা থেকে হিজরত করতে প্রবলভাবে বাধা প্রদান করছিলো, যাতে তিনি তার ধন-সম্পদ মক্কার বাইরে নিয়ে যেতে না পারেন।

রাসুলের সঙ্গে হিজরতের সৌভাগ্য হয়নি বলে সুহাইব ইবনে সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনটা বেশ কয়েক দিন বিমর্ষ হয়ে রইলো। তবে তিনি হাল ছাড়লেন না। মনে মনে নতুন এক কৌশল রচনা করলেন।

প্রতিরাতেই তার বাড়ির বাইরে কুরাইশদের পাহারা বসতো। এক রাতে তিনি বারবার বাড়ির বাইরে যেতে লাগলেন। কুরাইশ পাহারাদাররা মনে করলো নিশ্চয় সুহাইবের পেট খারাপ হয়েছে। একজন তাকে তিরস্কার করে বলে উঠলো, 'লাত ও উজ্জার কসম! তার তো পেট খারাপ করেছে।' এটা বলে তারা হাসাহাসি করতে লাগলো।

এভাবে তাকে বার কয়েক আসা-যাওয়া করতে দেখে কুরাইশরা তাদের পাহারায় ঢিল দিয়ে নিজ নিজ জায়গায় শুয়ে পড়লো। এই সুযোগে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপিসারে তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আল্লাহর নাম নিয়ে রাতের অন্ধকারেই মদিনার দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই কুরাইশ পাহারাদাররা তার পালিয়ে যাবার বিষয়টি ধরে ফেলে। তৎক্ষণাৎ তারা দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। বেশ কিছুদূর ধাওয়া করে কুরাইশরা দূরে সুহাইবের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেলো। তারা আরো দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু পেছনে কুরাইশদের ধাওয়াকারী দলকে দেখতে পেয়েই একটি অনুচ্চ টিলায় উঠে গেলেন। সেখানে উঠে ধনুকে

তির যোজনা করে কুরাইশদের দিকে লক্ষ্যস্থির করে উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগলেন, 'কুরাইশের পা-চাটা পাহারাদাররা! তোমাদের ভালো করেই জানা আছে– তিরন্দাজিতে আমি পুরো মক্কার মধ্যে সেরা। আর নিশানাবাজিতে আমার কখনো ভুল হয় না। আমার তূণীরে যা তির আছে, তা দিয়ে তোমাদের প্রত্যেককে আমি তোমাদের জায়গায়ই শুইয়ে ফেলতে পারবো। তির শেষ হয়ে গেলে আমার তলোয়ার তো আছেই। আমার হাত থেকে তোমাদের বেঁচে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।'

কুরাইশদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো, 'খোদার কসম! তুমি জীবন বাঁচিয়ে মক্কা ছেড়ে চলে যাবে আবার তোমার সমুদয় ধন-সম্পদও কুক্ষিগত করে রেখে যাবে, তা হতে পারে না। তুমি মক্কায় এসেছিলে নিঃস্ব হাতে, এখানে এসেই সব ধন-সম্পদের মালিক হয়েছো।'

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যদি আমার যাবতীয় ধন-সম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দিই, তাহলে কি তোমরা আমাকে যেতে দেবে?'

এ কথা শুনে কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে একটু সলাপরামর্শ করে নিলো। তারপর বললো, 'হ্যাঁ, তুমি যদি তোমার অর্জিত সকল ধন-সম্পদ আমাদের হস্তগত করে নিঃস্ব অবস্থায় চলে যাও, তাহলে আমরা তোমাকে যেতে দেবো।'

এবার সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু টিলা থেকে নেমে তাদের সঙ্গে আবার মক্কায় এলেন। নিজের ধন-সম্পদ যা ছিলো সব কুরাইশদের হাতে তুলে দিলেন। কুরাইশরা ধন-সম্পদ পেয়ে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পথ ছেড়ে দিলো। তিনি দেরি না করে তখনই মদিনার পথ ধরলেন।

মদিনা দূরের পথ। প্রায় তিনশো মাইল। তাতে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। তার মনে খুশির জোয়ার বইছে। নিজের অর্জিত সকল ধন-সম্পদ শত্রুর হাতে দিয়ে তিনি নিঃস্ব এখন। তাতে তার সামান্যতম দুঃখবোধ নেই। আবার রাসুলের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় সব ভুলে গেছেন তিনি। রাস্তায় যখনই ক্লান্তি এসে ভর করতো, রাসুলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ভাবতেই শরীর-মন আবার

চাঙা হয়ে উঠতো। কোনো প্রকার বিশ্রাম ছাড়াই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পৌছান মদিনায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন কুবায় কুলসুম ইবনে হিদামের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সোল্লাসে বলে ওঠেন, 'হে আবু ইয়াহইয়া! যে ব্যবসা করে এসেছো, তা তো অত্যন্ত লাভজনক হয়েছে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একবার নয়, তিন-তিনবার তাকে দেখে এভাবে উল্লাস প্রকাশ করেন। রাসুলের উল্লাস দেখে খুশিতে সুহাইব ইবনে সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার সংবাদ নিয়ে আমার আগে তো কেউ মক্কা থেকে এখানে আসেনি। আপনি আমার ব্যবসার কথা কীভাবে জানলেন? নিশ্চয় জিবরাইল আলায়হিস সালাম আপনাকে সংবাদ দিয়েছেন।'

হজরত সুহাইব ইবনে সিনানের ব্যবসা সত্যিই লাভজনক হয়েছিলো। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে তার এ ব্যবসাকে লাভজনক বলে সত্যায়ন করেন– 'ওয়া মিনান্নাসি মায়য়্যাশরি নাফসাহু ইবতিগায়ি মারদাতিল্লাহ। ওয়াল্লাহু রউফুম বিলইবাদ'–

'কিছু মানুষ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবনও বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তার এমনসব বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল।'

জীবন থেকে নেয়া

হিজরতের পর মদিনায় হজরত সুহাইব ইবনে সিনান রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেজবান করা হয় সাদ ইবনে খুজায়মাকে এবং তার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয় হারিস ইবনুস সাম্মা আল আনসারির সঙ্গে।

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দক্ষ তিরন্দাজ। বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসুলের সহযোদ্ধা হওয়ার গৌরব অর্জন

করেন। বৃদ্ধ বয়সে এসব যুদ্ধের কথা তিনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে লোকদের কাছে বর্ণনা করতেন। রাসুলের পাশে থেকে যুদ্ধ করার সৌভাগ্যকে তিনি নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে অভিহিত করতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যকে তিনি অত্যন্ত ভালোবেসে বরণ করেছিলেন। মদিনায় সংঘটিত যেকোনো ঘটনায় তিনি রাসুলের কাছাকাছি থাকতেন। তিনি নিজেই বলেন, 'মদিনায় রাসুলের প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি ভূমিকায় আমি উপস্থিত থেকেছি। যুদ্ধ হোক বা অন্য কোনো কারণে যখনই তিনি কোনো বায়আতের ডাক দিতেন, আমি প্রতিটি বায়আতে অংশ নিয়েছি। রাসুলের ছোট-বড় সকল যুদ্ধে আমি তাঁর সঙ্গে থেকেছি। প্রতিটি যুদ্ধে হয়তো তাঁর ডানে নয়তো বামে আমার অবস্থান থাকতো। আমার জীবদ্দশায় যতো যুদ্ধে মুসলমানরা যেখানেই সামনের অথবা পেছনের শত্রুর ভয়ে ভীত হয়েছে কিংবা সাহসী হয়ে এগিয়ে গিয়েছে, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কখনো আমার ও শত্রুর মাঝখানে হওয়ার অবকাশ দিইনি। আমি তাঁর ঢাল হিসেবে থাকতাম। এভাবেই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।'

হজরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর অত্যন্ত শ্রদ্ধাবোধ ছিলো। তিনি তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। নিজের মৃত্যুর আগে তিনি অসিয়ত করে যান, তার জানাজার নামাজ যেন হজরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ান। এমনকি যতোক্ষণ পর্যন্ত নতুন খলিফা নির্বাচন না করা হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন খলিফার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

খলিফার অসিয়ত অনুযায়ী সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর তিন দিন অত্যন্ত সুচারুরূপে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও দরাজদিলের মানুষ ছিলেন। হাত খুলে দান-সদকা করতেন। খলিফা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাকে ঠাট্টা করে বলেন, 'তোমার আধো আধো কথা আমার একদমই ভালো লাগে না। প্রথম কারণ হলো– তোমার উপনাম আবু

ইয়াহইয়া। এ নামে একজন নবি ছিলেন এবং এ নামে তোমার কোনো সন্তানও নেই। দ্বিতীয়ত– তুমি বড় অমিতব্যয়ী। তৃতীয়ত– তুমি আরব না হয়েও নিজেকে আরব বলে দাবি করো।'

এর জবাবে সুহাইব ইবনে সিনান রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "প্রথমত– আমার উপনাম আমি নিজে নির্ধারণ করিনি, বরং আল্লাহর রাসুল নিজে আমাকে এই উপনাম নির্বাচন করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত– আমার অমিতব্যয়িতার কারণও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস। তিনি বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে মানুষকে অন্নদান করে এবং সালামের জবাব দেয়।' তৃতীয়ত– আমি সত্যিকার অর্থেই একজন আরব। ছোটবেলায় রোমানরা আমাকে অপহরণ করে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়, তাই আমি বহু বছর দাস হিসেবে জীবন যাপন করি। এ কারণে আমি আমার গোত্রের নাম-পরিচয় ভুলে যাই এবং আরবি ভাষাও ভুলে যাই। বস্তুত আমি এক আরব সন্তান।"

হজরত সুহাইব ইবনে সিনান রুমি রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৮ হিজরি সনে ৭২ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।

অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা

আবু আহমদ হোসাইন ইবনে মুসা বাগদাদের ধনী ব্যবসায়ী। বসবাস করেন বাগদাদের অভিজাত এলাকায়। তার মহল্লার এক লোক ইন্তেকাল করেছে আজ। কিন্তু তিনি জানাজায় শরিক হতে পারছেন না। বসরা থেকে কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধু এসেছেন। তাদের সঙ্গে জরুরি কথাবার্তা হচ্ছে। অবশ্য বাড়িতে তার চাকর-নওকরের অভাব নেই। একজনকে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

তিনি তার বাড়ির এক বৃদ্ধ নওকরকে ডাকলেন। তাকে বললেন, তার বদলে আজকের জানাজায় শরিক হতে। বৃদ্ধ নওকর কিছু না বলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবু আহমদ বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

'জি মালিক, আমি জানাজায় যেতে পারবো না।'

'যেতে পারবে না মানে?'

'জি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি– জীবনে কোনো দিন কোনো জানাজায় যাবো না।'

'মানে কী? হয়েছেটা কী তোমার? কী কারণে এমন প্রতিজ্ঞা করেছো?'

'সে অনেক কথা। বিশেষ এক ঘটনার কারণে আমি কসম খেয়েছি– বাকি জীবনে আর কোনো দাওয়াত খেতে যাবো না এবং কোনো জানাজায়ও শরিক হবো না।'

আবু আহমদ কৌতুক বোধ করলেন। তিনি বৃদ্ধ নওকরকে ডেকে বাড়ির ভেতরে বন্ধুদের কাছে নিয়ে গেলেন। সবার সামনে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার এ নওকর প্রতিজ্ঞা করেছে– জীবনে সে কোনো দাওয়াতে যাবে না এবং কোনো জানাজায়ও যাবে না। কী কারণে সে এমন প্রতিজ্ঞা করেছে, সেটা সে আমাদের বলবে আজ।'

বৃদ্ধ নওকরের দিকে তাকিয়ে আবু আহমদ বললেন, 'বলো দেখি, তোমার এমন প্রতিজ্ঞার পেছনের কাহিনি কী!'

বৃদ্ধ নওকর বলতে লাগলো, 'অনেক দিন আগের কথা। আমি বাগদাদ থেকে একবার বসরা গেলাম। এশার নামাজ পড়ে মসজিদের বাইরে বেরিয়েছি, এমন সময় বসরার রাজপথে চলতে চলতে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হলো। সে আমার ডাকনামে না ডেকে অন্য নামে ডাকলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটি মাতাল। মদ খেয়ে মাতলামি করছে। এসে কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়াই আমার হাত ধরে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে লাগলো।

হাঁটতে হাঁটতে সারাক্ষণ এটা সেটা বলে উল্লাস প্রকাশ করছিলো। অনর্থক নানা বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করছিলো। সে আমার কাছে এমন এক গোত্রের ব্যাপারে প্রশ্ন করলো, যাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না।

আমি কোনোভাবে তার কাছ থেকে মুক্ত হতে চাইলাম। এখানে কোনো ধরনের হাঙ্গামা হোক, তা আমি চাইছিলাম না। কিন্তু সে আমার হাত ধরে রাখলো এবং তার সঙ্গে তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রবল আগ্রহ দেখালো।

প্রথমত আমি সেখানে এক আগন্তুক ছিলাম। আবার বসরার কোনো জায়গা ভালোভাবে চিনতামও না। তাই রাতটুকু তার বাড়িতে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। হাজার হোক, লোকটা মাতাল হলেও বাড়িটা নিশ্চয় মাতাল নয়। রাতটা কোনোমতে কাটিয়ে দিতে পারলেই হবে।

সে আমাকে ধরে তার বাড়িতে নিয়ে গেলো। আমার সঙ্গে বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা ছিলো। সেগুলোর ব্যাপারে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত বোধ করলাম।

তার বাড়িতে পৌঁছালাম। বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখি সেখানে অনেক মানুষ দাওয়াতের খাবার খেয়ে আকণ্ঠ মদপান করছে। বুঝতে পারলাম,

আমার সদ্য পরিচিত লোকটিও এতোক্ষণ এখানেই বসে মদপান করেছে। কী কাজে যেন এখান থেকে বাইরে বের হয়েছিলো। প্রবল নেশার ঘোরে সে আমাকে তার বন্ধু ভেবে তার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কেন যে এই মাতালের সঙ্গে আসতে গেলাম–এমন ভেবে ভেবে নিজেকে গালমন্দ করতে লাগলাম। কিন্তু তখন আর বাইরে বেরোনোর উপায় ছিলো না।

কিছু খাওয়াদাওয়া করে আমি ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে ঘুমের বন্দোবস্ত করতে লাগলো। ঘুমানোর জন্য সবাই যখন বিছানায় গেলো, আমিও তাদের মাঝামাঝি এক জায়গায় শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবছি– কোনোমতে রাতটা কাটাতে পারলেই বাঁচি!

ঘরে ঘুমানো লোকদের মধ্যে একজন ক্রীতদাসও ছিলো। সে-ও সবার সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলো। কিছুক্ষণ পর দেখলাম এক লোক ওই ঘুমন্ত ক্রীতদাসকে খুন করার জন্য ছুরি হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে রইলাম।

ভাগ্য ভালো যে, ছুরিকাঘাত করার আগেই ক্রীতদাসটি জেগে ওঠে। হত্যায় উদ্যত লোকটি ক্রীতদাসকে জাগতে দেখে নিজ বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। হত্যাকারীর বিছানা ক্রীতদাসের মালিকের বিছানার পাশেই ছিলো। লোকটির নড়াচড়ায় মালিকও সজাগ হয়ে উঠে বসলো।

ঘুম থেকে জেগেই ক্রীতদাস তার প্রভুর কাছে অভিযোগ করলো, 'কে যেন অন্ধকারে আমার বিছানার পাশে এসে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। আমি জেগে উঠলে সে সরে যায়। অন্ধকারের দরুন আমি তাকে চিনতে পারিনি।'

মালিক ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে একটি চাকু বের করলো। চাকু দেখেই আমি কেঁপে উঠলাম। আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগলো। সে আমার আরেকটু কাছে এলেই আমার কম্পন দেখে আততায়ী মনে করে হয়তো আমার বুকেই ছুরি চালাতো। কিন্তু আল্লাহ আমার হায়াত আরো কিছুদিন অবশিষ্ট রেখেছেন। ক্রীতদাসের মালিক কী ভেবে তার পাশের ব্যক্তির

বুকে হাত দিতেই দেখলো তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। অবশ্য সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ঘুমের ভান করে পড়ে ছিলো। কিন্তু মালিক কালবিলম্ব না করে তার মুখ চেপে ধরে তার বুকে আমূল ছুরি গেঁথে দিলো। সে তখনই ছটফটিয়ে মৃত্যুকোলে ঢলে পড়লো।

এবার মালিক সেখানে আর দেরি না করে তার ক্রীতদাসের হাত ধরে মুহূর্তের মধ্যে দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ভাবলাম, আমি এখানে অপরিচিত মানুষ। যে আমায় নিয়ে এসেছে ঘুম থেকে জেগে সে-ও আমায় চিনবে না। কারণ, সে নেশার ঘোরে আমায় এখানে এনেছে। সকালে সবাই আমায় খুনি ভেবে খুনের দায়ে হত্যা করে ফেলবে।

এমন ভাবনায় বজ্রাহতের মতো দ্রুত জামা-জুতো উঠিয়ে বাইরে বের হয়ে অজানার পথে ছুটতে লাগলাম। জানা ছিলো না কোথায় আমার গন্তব্য।

মধ্যরাত, অন্ধকারে আমার গা ছমছম করছিলো। এভাবে চলতে চলতে এক হাম্মামের পাশে বসে পড়লাম। ভাবলাম, ভোরে হাম্মাম খুললে ভেতরে ঢুকে পড়বো। একদম সাফ-সুতরো হয়ে বেরোবো।

কিছুক্ষণ পর এক সওয়ারির পায়ের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠলাম। হঠাৎ আড়াল থেকে কাউকে বলতে শুনলাম, 'হে অপরাধীর সন্তান! আমি তোকে দেখে ফেলেছি।'

এমন হুমকি শুনেই আমার অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হলো। অদৃশ্য আগন্তুক এবার আমার কাছাকাছি চলে এলো। আমি ভয়ে পাথরের মতো জমে গেলাম। আমার নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। চুপচাপ দেয়ালের সঙ্গে লেগে রইলাম। সে খোলা তলোয়ার হাতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাকে না দেখে চলে গেলো।

কিছুক্ষণ পর লোকটি কিশোরী একটি মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলো এবং মেয়েটিকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। তাকে বাঁধার পর সেখানে শুইয়ে তাকে জবাই করে তার নিথর দেহ সেখানেই ফেলে রাখলো। রক্তাক্ত লাশের দিকে একবার তাকিয়েই সে আবার নিজের পথে চলে গেলো। আর পেছন ফিরে তাকালো না।

আমি রুদ্ধশ্বাসে সব দেখছিলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি কিছুক্ষণ নড়াচড়া করতে পারলাম না। অজ্ঞাত খুনি চলে গেলে দ্রুত মৃত মেয়েটির নিথর দেহের কাছে গেলাম। বেশ ভদ্রঘরের মেয়েই মনে হলো। পোশাক-আশাকেও সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছে। লোকটি এভাবে কেন তাকে হত্যা করে গেলো—আল্লাহ্ মালুম!

মেয়েটির দু'পায়ে সুন্দর দুটো নূপুর চোখে পড়লো। নিজের লোভকে মানাতে পারলাম না। নূপুর দুটো খুলে নিলাম মেয়েটির পা থেকে। এদিক-ওদিক একবার তাকিয়েই আবার ছুটলাম রাস্তায়। দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে পুনরায় অজানা পথে চলতে থাকলাম।

চলতে চলতে আবার সেই হাম্মামের কাছে এসে দেখি তার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। জলদি ঢুকে পড়লাম। হাম্মামে ঢুকে আমার কাপড়গুলো পাহারাদারের হাতে দিলাম। ভেতর থেকে একদম সাফ-সুতরো হয়ে বের হলাম।

গোসলখানা থেকে বেরোতে বেরোতে সকাল হয়ে গেলো। পোশাক পরে নিলাম। নূপুর দুটি আমার স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে রেখে পথে নামলাম। সন্ধান করে জানলাম, কাছাকাছি আমার এক বন্ধুর বাড়ি রয়েছে। কোনো কিছু চিন্তাভাবনা না করে তার বাড়ির দিকে ছুটলাম।

বন্ধু আমায় দেখে ভীষণ খুশি হলো। কুশল বিনিময় শেষে স্বর্ণমুদ্রা এবং নূপুর দুটো তার হাতে দিয়ে বললাম, 'এগুলো তোমাকে আমানত রাখতে হবে।'

বন্ধু সানন্দে স্বর্ণমুদ্রা আর নূপুর দুটো গ্রহণ করলো। কিন্তু নূপুর দুটোতে চোখ পড়া মাত্রই তার চেহারার রঙ পাল্টে গেলো। তার এ অবস্থা দেখে বললাম, 'হঠাৎ তোমার কী হলো?'

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি এই নূপুর কোথায় পেয়েছো?'

আমি কোনো রকম ভণিতা না কারে তাকে রাত থেকে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনা খুলে বললাম। সে নিজের সিন্দুকে আমার অর্থগুলো

রেখে জানতে চাইলো, 'তুমি কি সেই মেয়ের হত্যাকারীকে চিনতে পারবে?'

উত্তর দিলাম, 'চেহারায় চিনবো না। কেননা রাতের আঁধারের কারণে আমি তার মুখ দেখতে পারিনি। তবে তার আওয়াজ শুনলে অবশ্যই চিনতে পারবো।'

বন্ধু বাইরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর অল্পবয়সী এক সিপাহিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরলো। তার সঙ্গে কথা বললো এবং ইশারায় আমার কাছে জানতে চাইলো এই সেই খুনি কি না? আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলাম।

আমরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করলাম। আমার বন্ধু মদ আনলে সিপাহিটি আকণ্ঠ মদ পান করে মাতাল হয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমার বন্ধু দরজা বন্ধ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করলো।

এরপর আমায় বললো, 'মৃত মেয়েটি ছিলো আমার ছোটবোন। কোনো এক কারণে রাগ করে আমি তাকে গতকাল ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলাম। সে এই সিপাহির কাছে চলে যায়। হয়তো দুজনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো।

'তবে আমি জানি না, এরপর এমন কী ঘটলো যে, সে আমার বোনকে হত্যা করে ফেললো। তোমার হাতে ওই নূপুর দেখে চিনে ফেলি যে, ওগুলো আমার বোনের নূপুর। আমি বাইরে গিয়ে লোকদের কাছে আমার বোনের ব্যাপারে জানতে চাই। লোকেরা বলে, সে অমুকের কাছে আছে।

লোকদের বললাম, বোনের ওপর এখন আর আমার রাগ নেই। তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন এই ব্যক্তি আমার সামনে কথা বলতে গিয়ে কেমন জড়িয়ে ফেলে। আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে, সে-ই আমার বোনকে হত্যা করেছে। যেমনটা তুমি বলেছো। সুতরাং আমিও তাকে হত্যা করে ফেললাম। এবার ওঠো, ওকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।'

আমরা দুই বন্ধু মিলে রাতের আঁধারে লোকচক্ষুর আড়ালে যুবকের লাশ দাফন করলাম। এরপর বসরা থেকে অনেকটা পালিয়েই আমি বাগদাদ ফিরে এলাম।

সেদিন থেকে কসম করেছি, না কোনো দাওয়াতে শরিক হবো আর না কারো কাছে আমানত রাখবো।

***

এবার জানাজা না পড়ার কারণটা শুনুন। একবার গরমের দিনে আমি কী এক কাজে বাগদাদের বাইরে বের হলাম। পথিমধ্যে দুই ব্যক্তিকে দেখলাম কাঁধে লাশ নিয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, না জানি কোন অচেনা ব্যক্তির লাশ। তাদের সহায়তা করলে সওয়াব মিলবে। সুতরাং দুই ব্যক্তির একজনের পরিবর্তে আমি লাশের খাটিয়া কাঁধে তুলে নিলাম।

কিছুক্ষণ পর আমার পাশের লোকটি কোথায় গায়েব হয়ে গেলো, বহু চেষ্টা করেও তার ছায়াটি খুঁজে পেলাম না। আমার অস্থিরতা দেখে অপর ব্যক্তি বললো, 'তাকে খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই, সে চলে গেছে। তুমি চুপচাপ সামনে চলতে থাকো।'

বললাম, 'খোদার কসম! আমি এখনই খাটিয়া নিচে রেখে দিচ্ছি।'

অচেনা ব্যক্তি বললো, 'তুমি এমন করলে খোদার কসম আমিও খাটিয়া ফেলে চলে যাবো!'

তার কথায় দমে গিয়ে মনে মনে বললাম, ঠিক আছে যেতে থাকি, সওয়াব তো পাবো।

আমরা লাশটি কবরস্থানে নিয়ে গেলাম। খাটিয়া মাটিতে রেখেই দ্বিতীয় ব্যক্তিও ছুটে কবরস্থান ত্যাগ করলো। ভাবলাম, ওই দুটি নির্বোধ এমন কেন করছে? এটা তো সওয়াবের কাজ!

আমি পকেট থেকে স্বর্ণমুদ্রা বের করে হাঁক দিলাম, 'হে কবর খননকারী! এই লাশের কবর কোনটি?'

সে বলতে পারলো না। আমি বললাম, 'দ্রুত একটি কবর খনন করো।'

সে দুই দিরহামের বিনিময়ে কবর খনন করলো। কবর খনন করা শেষ হলে আমি লাশের পায়ের দিক ধরে তাকে মাথার অংশ তুলে কবরে রাখতে বললাম।

সে লাশে হাত দিয়েই সপাটে আমার মুখে চড় মেরে চিৎকার জুড়ে দিলো, 'খুনি! খুনি...!'

মুহূর্তের মধ্যে কবরস্থান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। তারা প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলে কবর খননকারী বললো, 'এ ব্যক্তি এই লাশ দাফনের জন্য এনেছে অথচ লাশের মাথাই নেই।'

চাদর সরিয়ে দেখলাম, সত্যিই লাশের মাথা নেই। আমি যুগপৎ বিস্ময় এবং ভীতিতে শিউরে উঠলাম। সবাই ঘৃণা এবং রাগী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, ছিন্ন মস্তকের লাশের সঙ্গে সঙ্গে আমায়ও হয়তো কবরে যেতে হতে পারে!

লোকেরা আমায় শহরের কোতোয়ালের হাতে তুলে দিলো। কোতোয়াল কোনো রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার শরীরের ওপরভাগের কাপড় খুলে ফেললো। আমি নির্বাক নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম।

কোতোয়ালের দফতরে একজন বিচক্ষণ সহকর্মী ছিলো। সে আমার বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থা দেখে বললো, 'আমায় অনুমতি দিলে আমি তার ব্যাপারে কিছু তদন্ত করতে চাই। তাকে দেখে নির্দোষ এবং অবস্থার শিকার মনে হচ্ছে।' কোতোয়াল তার আবেদন মঞ্জুর করলো।

সে আমায় আলাদা জায়গায় নিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। আমি সত্য সত্য সব খুলে বললাম। আমার কথা শুনে সহকারী লাশের দেহ থেকে কাফনের কাপড় খুলে ফেললো। লাশের সঙ্গে একটি কাগজে লেখা ছিলো– 'এ লাশ অমুক মসজিদ থেকে এসেছে, যার অবস্থান অমুক জায়গায়।'

সঙ্গে সঙ্গে সে কয়েকজন সিপাহিসহ ছদ্মবেশে চিঠিতে উল্লিখিত মসজিদে পৌঁছে গেলো। সেখানে এক দর্জিকে পেয়ে তার কাছে লাশের খাটিয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে দর্জি বললো, 'একটি খাটিয়া মসজিদে ছিলো, কিন্তু এখন তো পাওয়া যাবে না। গতকাল এখান থেকে একটি লাশের সঙ্গে সেটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

সিপাহিরা জানতে চায়, 'লাশ বহন করেছিলো কারা?'

উত্তরে দর্জি ইশারায় পাশের একটি বাড়ি দেখিয়ে বলে, 'ওই বাড়ির অমুক অমুক।'

সিপাহিরা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ঘেরাও করে ভেতর থেকে কয়েক যুবককে আটক করলো। তাদের কোতোয়ালের দফতরে নিয়ে ওই লাশের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে স্বীকার করলো, 'মৃত যুবকও আমাদের সঙ্গেই থাকতো। একটি বিষয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি হলে আমরা তাকে হত্যা করি এবং তার কর্তিত মস্তক এই ঘরে মাটিচাপা দিই। প্রথমে যে দুজন তাকে কাঁধে বহন করে, তারাও আমাদের সঙ্গেই ছিলো। পরে ওরা দুজন গোপনে লাশ কবরস্থানে রেখে পালিয়ে যায়।'

কোতোয়াল এবার বিলম্ব না করে তাদের গ্রেফতার করে আমাকে মুক্ত করে দেয়।

এ কারণেই আমি শপথ করেছি, আর কখনো কোনো জানাজায় শরিক হবো না।

আবু আহমদ তার নওকরের মুখ থেকে এমন চমকপ্রদ ঘটনা শুনে বললেন, 'থাক বাবা, তোমার আর কোনো জানাজায় বা দাওয়াতে যাবার দরকার নেই। তুমি বরং আমার বাড়িতেই বসে থাকো!'

অলৌকিক

লোকটির বাড়ি ইরাকের মসুলে।

নাম আলি ইবনে হারব।

সমাজে সৎব্যক্তি হিসেবে তার পরিচিতি আছে।

গল্পটি বলেছিলেন তিনি নিজেই। নিজের জীবনের গল্প।

আশ্চর্য এক গল্প। ভীতিপ্রদ এক কাহিনি।

আলি ইবনে হারব বলেন–

আমি নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কেনার জন্য মসুল থেকে সুররামান রায়া নামক স্থানে যাচ্ছিলাম। সেখানে যেতে হলে আমাকে যেতে হবে নদীপথে। দজলা নদী। নদীতে কিছু নৌকা ছিলো, যেগুলো ভাড়ায় লোকজন ও মালামাল পারাপার করতো। আমি একটি নৌকায় আরোহণ করলাম।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, একটু পরই নৌকা আমাদের নিয়ে সুররামান রায়ার দিকে চলতে শুরু করলো।

আবহাওয়া ছিলো চমৎকার। আকাশ পরিচ্ছন্ন ছিলো। নদীও শান্ত। দজলার মৃদুমন্দ ঢেউ ভেঙে নৌকা তরতর করে বয়ে চলছিলো।

নৌকায় মালামাল ব্যতীত যাত্রী ছিলাম আমরা পাঁচজন। যাত্রীদের অধিকাংশই তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলো। আমি দাজলার দুই তীরের মনোলোভা

দৃশ্যাবলি দেখছিলাম। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অপূর্ব রূপমহিমা ঢেলে সাজিয়েছেন যেন এ অঞ্চলে। দেখছি আর আপনা থেকেই অন্তর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠছে।

মাঝনদী দিয়ে নৌকা বয়ে চলছে, হঠাৎ পানি থেকে একটি বড় মাছ লাফিয়ে নৌকায় এসে পড়লো। সবাই বেশ হকচকিয়ে গেলো। আমি ছুটে গিয়ে মাছটি ধরে ফেললাম। বিশালকায় মাছের লেজের ঝাপটানিতে সেটাকে ধরে রাখাই দায়। আরো দু-একজন এসে আমাকে সাহায্য করলো।

মাছটিকে বাগে আনার পর যাত্রীদের একজন বললো, এ মাছ আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা সামনে তীরে কোথাও নেমে মাছটি ভুনা করে খেতে পারি। দুপুর বেশ গনগনিয়ে আছে। আমাদের ক্ষুধাও পেয়েছে।

তার কথায় দ্বিমত পোষণ করার মতো কিছু পেলাম না আমরা। এমন বড় মাছ সচরাচর পাওয়া যায় না, আর পাওয়া যায় না এমন মোক্ষম সময়। সুতরাং সকলে একমত হওয়ায় নিকটবর্তী তীরের দিকে নৌকা ঘুরিয়ে দেওয়া হলো।

আমরা তীরে অবতরণ করে ঘন গাছবিশিষ্ট এক জায়গায় অবস্থান করলাম, যাতে জ্বালানি জমা করে মাছটি রান্না করা যায়। নদীর এ তীরটি একেবারে জনমানবশূন্য। বড় বড় গাছ আর আগাছায় ভরে আছে চারপাশটা। দেখলেই গা ছমছম করে ওঠে। তবু আমরা নদীর একেবারে তীরবর্তী একটি খালি জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে রান্নার আয়োজন করতে লাগলাম।

আচমকা আমাদের একজন পাশে থেকে চিৎকার করে উঠলে আমরা দৌড়ে তার কাছে ছুটে গেলাম। সেখানে গিয়ে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পেলাম। দেখলাম, একটি মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে, পাশেই পড়ে আছে একটি রক্তাক্ত ধারালো চাকু। মৃতদেহটির কাছেই অন্য এক যুবক হাত-পা এবং মুখে কাপড় বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। সে বাঁধনমুক্ত হওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।

আমরা দ্রুত কাছে গিয়ে তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলাম। তার চেহারায় অত্যন্ত ভীতি ও ক্লান্তির ছাপ। চোখজুড়ে রাজ্যের আতঙ্ক যেন বাসা বেঁধেছে।

বাঁধনমুক্ত হয়েই সে বললো, দয়া করে আমাকে একটু পানি দাও। আমরা তাকে পানি দিলাম। সে ঢকঢক করে অনেকটা পানি খেলো।

আমরা প্রথমে তাকে সুস্থির হতে দিলাম, যাতে সে কথা বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্থির হলো। এরপর আমাদের সে পূর্ণ ঘটনা শোনালো।

আমরা যাত্রীরা ঔৎসুক্য নিয়ে তার চারপাশে জড়ো হলে সে বলতে লাগলো– আমি ও এ মৃত ব্যক্তি ছিলাম একই কাফেলার যাত্রী। আমরা মসুল থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাগদাদে যাচ্ছিলাম। চলতি পথে এ ব্যক্তি আমার পরিচয় জেনে মনে করেছিলো, আমার নিকট অনেক অর্থ আছে। যেকোনোভাবে আমাকে বাগিয়ে সে আমার অর্থ হাতিয়ে নেয়ার ফন্দি আঁটতে থাকে।

পথিমধ্যে সে আমার সাথে আন্তরিকতা গড়ে তোলে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সে আমার ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়। নানা কাজে সে আমাকে অযাচিত সাহায্য করে আমার বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হয়। আমারও তার ওপর যথেষ্ট ভরসা ছিলো। তাছাড়া দূরের পথে চলার সময় এক যাত্রী স্বাভাবিকভাবেই অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আমরা অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিলাম। আমাদের প্রয়োজন ছিলো খানিকটা বিশ্রামের। তাছাড়া সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছিলো। সুতরাং কাফেলার সকলের সম্মতি নিয়ে আমরা এখানে তাঁবু ফেলে যাত্রাবিরতি করলাম। রাতটা এখানেই কাটিয়ে ভোরে ভোরে আবার আমরা রওনা হয়ে যাবো।

রাতের শেষভাগে কাফেলা রওনা হয়ে গেলো। কিন্তু আমি ঘুমিয়ে থাকায় কাফেলা রওনা হওয়ার কথা জানতে পারিনি। সম্ভবত রাতে খাওয়ার সময় লোকটি আমার খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলো।

আমাকে ঘুমের মধ্যেই নিহত ব্যক্তিটি রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। মুখও কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলে, যাতে আমি চিৎকার করতে না পারি। এরপর সে আমাকে হত্যা করার জন্য মাটিতে ফেলে শুইয়ে দেয়। আমার বুকের ওপর বসে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।

এ অবস্থায় আমি জেগে উঠি। আমার বুকের ওপর তার হত্যা-উদ্যত ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি দেখে আমি ভয়ে চিৎকার করতে চাই, কিন্তু মুখ বাঁধা থাকার কারণে কিছুই বলতে পারি না। কোনো রকম তাকে বোঝাতে সক্ষম হই যে– তুমি আমার সকল সম্পদ নিয়ে নাও, তবুও আমাকে প্রাণে মেরো না।

লোকটি এতে রাজি না হয়ে তার কোমরবন্ধনীর সাথে বেঁধে রাখা ধারালো চাকু বের করতে উদ্যত হলো। কিন্তু চাকুটি সহজে কোমরবন্ধনী থেকে বের হচ্ছিলো না। কোথাও সম্ভবত আটকে গিয়েছিলো। ফলে সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চাকু বের করতে গেলো। প্রচণ্ড জোরে টান দেয়ার ফলে কোমরবন্ধনী থেকে চাকুটি বের হয়ে তার নিজ গলায় বিদ্ধ হলো এবং গলার শাহরগ কেটে গেলো। লোকটি নিজের গলা ধরে চিৎকার করে আমার বুকের ওপর থেকে পড়ে গেলো। তার গলা দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগলো কিন্তু সে কিছুই করতে পারলো না। মাটিতে গড়াগড়ি করতে লাগলো। একসময় প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

এ পাপিষ্ঠ আমার চোখের সামনে তার পাপের শাস্তি পেয়ে গেলো। আমি আমার নিজের মৃত্যুর ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। কেননা আমরা যেখানে আছি, খুব কম লোকই এখানে যাত্রাবিরতি করে। ফলে বাঁধনমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। অবশেষে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করলাম– হে আল্লাহ! তুমি আমার নিকট কাউকে পাঠিয়ে আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো। আমি সর্বদা এ দোয়াই করছিলাম। এ কারণেই হয়তো আল্লাহ তোমাদের পাঠিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন। এবার বলো, তোমরা কী কারণে এ জনমানবহীন স্থানে আসতে বাধ্য হয়েছো?

আমরা বললাম, একটা মাছ আমাদের এখানে আসতে বাধ্য করেছে। যেটা পানি থেকে আমাদের নৌকায় লাফিয়ে উঠেছিলো। আমরা মাছটি ভুনা করে খাওয়ার জন্য এখানে এসেছি। মাছটি এখনো নৌকাতেই আছে।

কাফেলার লোকদের কথা শুনে ওই ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ওই মাছকে তোমাদের নৌকায় পাঠিয়েছিলেন আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। আল্লাহ তাআলার অসংখ্য শোকরিয়া!

আমাদের একজন নৌকার দিকে গেলো মাছটি আনার জন্য। এমন সময় সে দেখতে পেলো, মাছটি নৌকার পাটাতন থেকে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ইয়ামামার বাজপাখি

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মজলিসের মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন। কথা বলছিলেন সবার সঙ্গে। সাহাবারা তন্ময় হয়ে শুনছিলেন তাঁর কথা। মৌমাছির মতো তারা গভীর ধ্যানে একাগ্র হয়ে বসেছিলেন রাসুলের চারপাশে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন। কিন্তু একসময় কথার মাঝখানে হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। মাথা নিচু করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। সাহাবারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন– কী এমন হলো হঠাৎ!

একটু পর মাথা তুললেন আল্লাহর নবি। সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন– 'তোমাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি আছে– কেয়ামতের দিন যার মাঢ়ীর দাঁত জাহান্নামের মধ্যে উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড় আকার ধারণ করবে।'

সাহাবারা রাসুলের এমন আচমকা ভবিষ্যদ্বাণীতে চমকে যান। ভয়ে সকলের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। সকলেই এই আশঙ্কায় ভীত ছিলেন– না জানি আমিই সেই ব্যক্তি হয়ে যাই কি না এবং সেই অশুভ পরিণতিতে পতিত হয়ে পড়ি কি না!

সেখানে অন্য অনেকের সঙ্গে রাজ্জাল ইবনে উনফুহ নামে এক 'সাহাবা'ও বসা ছিলো।

কে এই রাজ্জাল

রাজ্জাল ইবনে উনফুহ্ বাস করতো মদিনা থেকে দূরবর্তী এক কবিলায়। রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মদিনা অবস্থানকালীন শেষদিকে সে তার কবিলা থেকে একদিন মদিনায় আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে বেশ কিছুদিন মদিনায় অবস্থান করে। মদিনায় থাকাকালীন সে কুরআনের অনেকাংশ শিখে ফেলে এবং ইসলামের হুকুম আহকাম সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হয়। ইসলাম বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর আবার সে তার কবিলায় ফিরে যায়। সেখানেই সে মুসলিম হিসেবে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করতে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করার পর হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হন। তার খেলাফতের প্রথম দিকেই রাজ্জাল ইবনে উনফুহ আবার মদিনা আসে এবং নবনির্বাচিত খলিফাকে জানায়, মুসায়লামাহ ইবনে হাবিব (মুসায়লামাতুল কাজ্জাব) নামের এক লোক নিজেকে নবি দাবি করেছে এবং সে তার পক্ষে অনেক লোক-লস্কর জড়ো করছে। তার ভাবগতি ভালো না, যে কোনো সময় মদিনা আক্রমণ করতে পারে।

খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সংবাদ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। রাজ্জাল তখন খলিফাকে বললো, আপনি আমাকে মুসায়লামার এলাকা ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করুন যাতে আমি সেখানকার মানুষকে সঠিক দীন বুঝাতে পারি এবং মুসায়লামার খবরাখবর মদিনা পাঠাতে পারি।

তার কথা অনুযায়ী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ইয়ামামা যাওয়ার অনুমতি দিলেন। রাজ্জাল খলিফার বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে ইয়ামামা এসে পৌঁছায়।

কিন্তু ইয়ামায় এসে সে ধন্দে পড়ে যায়। এখানে এসে দেখে, মুসায়লামার পেছনে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। তারা মুসায়লামাকে নবি হিসেবে দাবি করে তার নামে শ্লোগান দিচ্ছে। মুসায়লামা আরবে নিজের আধিপত্য বিস্তারের লোভে বিরাট এক সেনাবাহিনীও জড়ো করে ফেলেছে।

লাজ্জার নামের এই সাহাবি তখন নিজের স্বার্থসিদ্ধির লোভে পড়ে ইসলাম ত্যাগ করে মুসায়লামার দলে ঢুকে যায়। তার ইচ্ছা ছিলো, মুসায়লামার কাছ থেকে কিছু নগদ নারায়ণ খসানো এবং তার দলে ভালো একটা পদ গছানো। মুসায়লামাও খলিফার পাঠানো বিশেষ দূতকে নিজের অনুসারী হিসেবে পেয়ে দারুণ বর্তে যায়। সে তাকে নানাবিধ প্রলোভন দিতে থাকে।

মুসায়লামার চেয়ে ইসলামের জন্য রাজ্জাল আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। কেননা তার পূর্ববর্তী মুসলমান হওয়াটা যথেষ্ট গুরুত্ববহ ছিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগে সে মদিনায় থেকে কুরআনের অধিকাংশ আয়াত মুখস্ত করে নিয়েছিলো। এরপর সে খলফিাতুল মুসলিমিন হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দূতের ভূমিকাও পালন করেছিলো। এ সব কিছুকে সে মুসায়লামার উত্থান এবং তার নবুওতের দাবিকে তরান্বিত করার কাজে ব্যয় করতে থাকে। সে মানুষের মাঝে নিকৃষ্টতম মিথ্যার অবতারণা ঘটিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলে–

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসায়লামাহ ইবনে হাবিবকে নিজের (নবুওতের) ব্যাপারে শরিক করেছেন।'

এখন যেহেতু রাসুল ইন্তেকাল করেছেন, তাই মানুষের মধ্যে রাসুলের পর ওহি ও নবুওতের ইলম বহন করার ব্যাপারে সর্বাধিক হকদার যে ব্যক্তি– সে হচ্ছে একমাত্র মুসায়লামাহ!

রাজ্জাল তার মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, ধোঁকাবাজি ও ইসলামের সাথে তার পূর্বেকার সম্পর্ক দ্বারা অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালাতে থাকে। তার এমন অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডে মুসলমানদের সাথে তাদের আসন্ন যুদ্ধের জোরালো সংকেত ফুটে উঠে। তাদের এ সংবাদ মদিনায় পৌঁছলে মুসলমানরা মুরতাদদের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপে ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়ে।

রাজ্জালের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়াদের তালিকায় সেই সব মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন– যাদের মধ্যে সিরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাদিতে হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাবের নামটি স্বর্ণোজ্জ্বল দেদীপ্যমান।

সেই বীর

জায়েদ ইবনে খাত্তাব।
খলিফা উমরের বড় ভাই।
ইসলাম গ্রহণেও অগ্রগামী উমরের চেয়ে।
ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জনসম্মুখে ঘোষণা করেছিলেন বলিষ্ঠকণ্ঠে।
সকল যুদ্ধে রাসুলের সহযোদ্ধা। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন।
শাহাদাতের অনন্য পিয়াসী।

হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অসীম সাহসী। যথেষ্ঠ নিরব থাকা ছিলো তার বীরত্বের অন্যতম গুণ। আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও দীনের ওপর তার ঈমান ছিলো সর্বদা অনড়, অটল ও অবিচল। কোনো যুদ্ধে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পেছনে ছিলেন না। রাসুলের সামনে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং রাসুলের ঢাল হিসেবে নিজের শরীর পেতে দিয়েছেন। প্রতিটি জিহাদের যেমন তিনি শাহাদাতের অনন্য পিয়াসী ছিলেন, অনুরূপভাবে বিজয় ও নুসরাতের আকাঙ্ক্ষীও ছিলেন।

উহুদে তিনি অসীম সাহসের সাথে লড়ছেন। এমন সময় তার ভাই উমর লক্ষ করলেন জায়েদের বর্মটি খুলে পড়ে গেছে এবং সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি নাঙ্গা শরীরে শত্রুবাহিনীর মাঝখানে ঢুকে পড়ছেন। উমর ভাইকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি চিৎকার করে ভাইকে ডেকে বললেন– 'জায়েদ, এই নাও আমার বর্মটি। এটি পরে যুদ্ধ করো।'

জায়েদ উত্তর দিলেন– 'হে উমর, তোমার মতো আমারও তো শাহাদাতের সুমধুর পানীয় পান করার আকাঙ্ক্ষা আছে।'

এরপর বর্ম ছাড়াই প্রচণ্ড জানবাজি আর অসীম বীরত্বের সাথে লড়তে থাকেন।

এই বীরকেশরী যখন মুসায়লামা ও তার দোসর রাজ্জালের ব্যাপারে অবগত হন তখন থেকেই তিনি রাজ্জালের মুখোমুখি হওয়ার প্রহর গুণতে থাকেন। একাই নিজের তার জীবন সাঙ্গ করার পণ করেন। তার দৃষ্টিতে

রাজ্জাল শুধুমাত্র একজন ইসলামবিচ্যুত ধর্মদ্রোহীই নয়; বরং মহা মিথ্যুক, মোনাফেক ও মোহগ্রস্থ লোভী মানুষ। অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির লালসা চরিতার্থ করতে সে মুরতাদ হয়ে গেছে। হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মিথ্যা ও নিফাককে ঘৃণা করার ক্ষেত্রে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ছিলেন। রাজ্জালের সংকীর্ণ মন-মানসিকতা এ উভয় সহোদরকে এতোটা বিক্ষুব্ধ করেনি, যতোটা বিক্ষুব্ধ করেছে তার মুনাফেকি কার্যকলাপ। কারণ এর মাধ্যমে ফেতনার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠে জাজিরাতুল আরবে।

খলিফা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কালবিলম্ব না করে এই মুরতাদদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের ডাক দেন। ইয়ামামা অভিমুখে প্রেরণ করেন তাজাদম সেনাবাহিনী।

লড়াইয়ের ময়দানে

শুরু হয়ে গেছে ইয়ামামার যুদ্ধ। শত্রুপক্ষের বিশাল সৈন্যবাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণে মুসলিম বাহিনী তছনছ হয়ে পড়ছিলো। মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক হজরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম সৈন্যদের সমবেত করে তাদের প্রত্যেকের মাঝে পৃথক পৃথক দায়িত্ব বন্টন করে দেন। হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুও তার জিম্মাদারি বুঝে নিলেন।

যুদ্ধ চলছে। শত্রুবাহিনীর বনু হানিফা একবার এমন মারাত্মক আক্রমণ চালালো, মুসলিম বাহিনী পরজায়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো। কিছু সৈনিক তো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলো। এতে জায়েদের সাহস আরও বেড়ে গেলো। বুকের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলো। তিনি চিৎকার করে সাথীদের আহবান জানিয়ে বলতে লাগলেন–

'ওহে জনমণ্ডলি! তোমরা দাঁত কামড়ে ধরে শত্রু নিধন চালিয়ে যাও। তোমরা সুদৃঢ় থাক। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাদের পরাজিত না করা অথবা আমি আল্লাহর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কথা আমি বলবো না। আল্লাহর সাথে মিলিত হলে সেখানেই আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করে কথা বলবো।'

এরপর হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি টিলার নিচে গিয়ে দাঁত কামড়ে ধরে, ঠোঁট বন্ধ করে রাখলেন। যাতে মুখ দিয়ে কোনো কথা বের না হয়। তার কাছে রাজ্জালের বিনাশ যুদ্ধের বিনাশ হিসেবে চিহ্নিত হলো। তীরের মতো তীব্র গতিতে তিনি রাজ্জালকে খুঁজতে থাকেন।

এখন এই মুজাহিদ ডানে-বাঁয়ে চতুর্দিকে রাজ্জালের কাছে পৌঁছতে প্রাণান্তরক প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। যুদ্ধের ঘুর্ণিঝড় হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঢেকে নিলে তিনি জানবাজি রেখে তুমুল বেগে লড়াই চালিয়ে যান আর রাজ্জালকে খুঁজতে থাকেন। যেখানেই রাজ্জালের মাথা দেখা যেতো সেখানেই তিনি ছুটে যাচ্ছেন বিশাল শত্রুব্যূহ ঠেলে।

শেষ পর্যন্ত হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজ্জালের শিরদাঁড়ার সন্ধান পান। মিথ্যা, ধোঁকা, হীনম্মন্যতা আর অহমিকায় ভরা মাথার ওপর তিনি তরবারি দিয়ে আঘাত করতে থাকেন। এভাবে রাজ্জাল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এক চরম মিথ্যুক ও প্রতারক থেকে মুক্ত হয় বিশ্ব। এতে করে মুসায়লামা ও মুহকাম ইবনে তুফাইলের মনে মুসলমানদের ব্যাপারে চরম ভীতির সঞ্চার হয়।

মুসায়লামা তো তার বাহিনীকে নিশ্চিত বিজয়ের ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলো। বিজয়ী বেশে মুসায়লামা নিজে এবং তার পাশাপাশি রাজ্জাল ইবনে উনফুহ ও মুহকাম ইবনে তুফাইল তাদের বানোয়াট ধর্মের বিস্তার করে রাজত্ব কায়েমের স্বপ্নে বিভোর ছিলো। কিন্তু আজ! রাজ্জাল জীবন থেকে হাত ধুয়ে বসেছে। আগামীকাল মুহকাম ইবনে তুফাইল ও স্বয়ং মুসায়লামার জীবন সাঙ্গ হওয়ার ছিলো!

এভাবে হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর আক্রমণ মুসায়লামার বাহিনীতে চরম ধ্বংস ডেকে আনে। মুসলমানদের মাঝে এ বার্তা ছড়িয়ে পড়লে তাঁদের প্রত্যয় পাহাড়ের মতো দৃঢ় হতে থাকে। আহত মুসলমানদের অন্তরে নতুন আশার সঞ্চার হয়। তাদের জজবা বাড়তে আরম্ভ করে। নিজেদের আঘাতের পরোয়া না করে তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়াতে থাকেন। ইসলামের শত্রুদের চির বিদায়ের আগ পর্যন্ত তাঁরা বীর বিক্রমে লড়াই চালিয়ে যান।

***

হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আপন প্রতিপালকের বড়ত্ব ও মহত্ত্বের গুণগান গাইতে গাইতে এবং তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে করতে নিজের দু'টি হাত উঁচু করে ধরেন। এরপর উঠান তরবারি। আগের মতো চুপ থেকে চলতে থাকেন। অবিস্মরণীয় বিজয় বা শাহাদাত ব্যতীত তিনি কোনো কথা বলবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন।

ফলাফল মুসলমানদের পক্ষে আসতে শুরু করে। দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে বিজয়। হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বিজয় ও নুসরাতের এমন বাতাস বইতে দেখেন– যা ইতোপূর্বে কখনো আর দেখেননি। এবার তিনি নিজের মনোবাসনার প্রতি দৃষ্টি দেন। আহ্! আল্লাহ তায়ালা যদি এই ইয়ামামার যুদ্ধে আমাকে শাহাদাতের সুধা পান করার সুযোগ দিতেন! চতুর্দিকে যেন জান্নাতি বাতাস বইতে আরম্ভ করে যা তার অন্তরকে বিগলিত করে তোলে। চক্ষুকে তৃপ্তিতে ভরে রাখে। তাই তিনি এমন ব্যক্তির মতো লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন যারা সেই মহা পুরস্কারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

অবশেষে এই মর্দে মুজাহিদ তরবারি চালাতে চালাতে শহিদ হয়ে মাটির কোলে ঢলে পড়েন। বরং শাহাদাতের সুধা পান করে উঁচু মসনদে আরোহণ করেন। তিনি একজন সফল, সার্থক ও সৌভাগ্যবান হিসেবে তার চিরস্থায়ী সফরের দিকে চলে যান।

ভাইয়ের প্রতীক্ষা

এদিকে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী বেশে মদিনার দিকে ফিরে যায়। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সেই মহা সফল ও সৌভাগ্যবান ইয়ামামা প্রত্যাগত সৈনিকদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। তিনি খুবই আগ্রহ সহকারে তার বড়ভাই হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সন্ধান করতে থাকেন। হজরত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন লম্বা

গড়নের লোক। তাই বড় বড় জমায়েতে তাকে খুব সহজেই চেনা যেতো। কিন্তু আজ এতো চেষ্টা করেও হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ভাইকে দেখতে পাচ্ছেন না!

যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত মুজাহিদরা কাছে আসতেই তাদের কাছে ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে তিনি বলে ওঠেন–

'আল্লাহ জায়েদের ওপর রহম করুন। দুটি নেক কাজে তিনি আমার থেকে অগ্রগামী রয়ে গেলেন। আমার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমার আগে শাহাদাতও বরণ করলেন।'

যে সব বিজয় দিন দিন মুসলমানদের হাতে এসেছে, তার মধ্যে এমন কোনো বিজয় নেই– যাতে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ভাই হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্মরণ করেননি। তিনি সবসময় বলতেন–

'প্রভাতের এমন কোনো বায়ু প্রবাহিত হয় না, যেখানে আমি জায়েদের সুঘ্রাণ পাই না।'

প্রভাতের পূবালী বায়ু হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খুশবু নিয়ে আসে। তার চরিত্র মাধুরীর সুবাস ছড়িয়ে যায়। কিন্তু আমরা আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরোক্ত উক্তিতে আরো কিছু বাড়াতে চাই–

'ইয়ামামার দিন থেকে নিয়ে দিকে দিকে ইসলামের বিজয়ের যে সকল বাতাস বয়ে গেছে, ইসলাম সেখানে হজরত জায়েদ ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুবাস পেয়েছে। তার বীরত্ব, বাহাদুরি, ত্যাগ, কুরবানি, সাহস ও মহত্ত্ব পেয়েছে।'

খাত্তাবের পরিবার রাসুলের পতাকাতলে পরম সম্মান ও মহত্ত্বের সাথে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা সেদিনও বরকতময় হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন– যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সেদিনও তারা বরকতমণ্ডিত হয়েছেন– যেদিন তারা জিহাদ করেছেন এবং শাহাদাতের সন্ধানী হয়ে শহিদি মর্যাদা লাভ করেছেন। সেদিনও তারা বরকতময় ও সফল হিসেবে আখ্যায়িত হবেন, যেদিন তাদেরকে উঠিয়ে মহান প্রতিপালকের কাছে উপস্থিত করা হবে।

বেহেশতি হালুয়া

যুবকটির নাম ইউনুস, ইউনুস ইবনে আদম। বাড়ি সিরিয়ায়। দামেস্কের কাছাকাছি এক নিভৃত পল্লিতে থাকেন। এমনিতে সাদাসিধে লোক, কারো সাতে-পাঁচে নেই। বাচ্চাদের এক মাদরাসায় পড়ান। মাসান্তে যা আয়-রোজগার হয়, ও দিয়ে তার বেশ চলে যায়। বিয়েথা এখনো হয়নি। তাই সংসারের ঝুঁট-ঝামেলাও তাকে খুব একটা পোহাতে হয় না। নিজের জন্য যৎসামান্য যা না হলেই নয়, ওটুকু উপার্জন করতে পারলেই নামাজ-রোজা করে তার দিন চলে যায়।

বেশ ভালোই চলছিলো তার দিনকাল। কিন্তু একদিন হলো কী, হঠাৎই তার মতিভ্রম ঘটলো। যাকে বলে 'সুখে থাকলে ভূতে কিলায়'। এতোদিন ভাগ্যের ওপর নির্ভর করেই তিনি জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিন তার হঠাৎই মনের মধ্যে নতুন এক চিন্তা বাসা বাঁধলো– না, আর নয়, মানুষের চাহিদা কী উপায়ে বিনা পরিশ্রমে মেটানো যায়, তার উপায় অনুসন্ধান করতে হবে। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তার রিজিকের ব্যবস্থাও নিশ্চয় তিনি কোনো-না-কোনোভাবে করে রেখেছেন। তার জন্য এতো অস্থির হয়ে সারাদিন কাজ করার কোনো মানে হয় না।

যেই ভাবা সেই কাজ! তখনই উঠে দাঁড়ালেন। এতোক্ষণ ধরে মনে মনে যা চিন্তা করছিলেন তা আরেকবার আওড়ে নিলেন– 'আমি মানুষ। কাজেই প্রতিদিন দুনিয়ার সম্পদের একটা অংশ আমার চাহিদামতো আমি পাচ্ছি। আমার প্রয়োজনীয় ভোগ্যসামগ্রী আমি পাচ্ছি নিজের

পরিশ্রমে আর অন্যের সহযোগিতায়। জীবনধারণের এই পদ্ধতিকে আরো সহজতর করতে হবে, কী করে মানুষ তার জীবনধারণের রসদ পেয়ে থাকে, আমি তা অনুসন্ধান করবো। বাড়িতে বসে থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছু নাগালের মধ্যে কীভাবে পাওয়া যায়, তার উপায় অনুসন্ধান করবো। আর এ পথে সফল হতে হলে একমাত্র ধর্মের পথেই তা করতে হবে। কারণ, সত্যিকার ধার্মিক পুরুষরা কেবল আল্লাহ তাআলার ওপরই তাদের ভরণ-পোষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল থাকেন। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বিশ্বে খাদ্য-বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য প্রধানত সমাজের ওপর নির্ভর করতে হয়। এখন থেকে আর আমি সমাজের ধার ধারবো না। সর্বশক্তিমানের হাত থেকে আপনা হতে আমার প্রয়োজনীয় ভোগ্যসামগ্রী যাতে পাই, তার জন্য সম্পূর্ণভাবে সেই বিশ্ব প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে থাকবো। ভিক্ষুকরা দানশীল লোকদের দয়ার ওপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় ব্যক্তির মাধ্যমেই আল্লাহ তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। দান-খয়রাত করার জন্য ধনী লোকদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বলেই তারা দান করেছেন। কিন্তু এখন থেকে আমি আমার ভরণ-পোষণের জন্য দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির ধার ধারবো না–সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছু পেতে হবে আমাকে।'

বড়ই সুফিধর্মী চিন্তাভাবনা, বলতেই হবে। ইউনুস ইবনে আদম বাড়ি ছেড়ে পথে নামলেন। শহরের পথ ছেড়ে তিনি গ্রামাঞ্চলের দিকে রওনা হলেন। মাদরাসায় শিক্ষকতা করার সময় তার খাবার অন্য লোক সরবরাহ করতো, এখন থেকে খাবারের জন্য তাকে অদৃশ্য এক মহাসত্তার ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। অদৃশ্য মহাসত্তা যখন তাকে খাবার দেবেন, তখনই তিনি খাবেন।

দিনভর পথ চলতে লাগলেন। তার কোনো গন্তব্য নেই, দু'চোখ যেদিকে যায় সেদিকেই চলছেন। দিনমান চলতে চলতে এক নদীর কিনারে এসে পৌঁছালেন। শান্ত-সুনিধি নদীর জল। নদীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে নিরবধি অজানা কোনো গন্তব্যের পানে।

সাধক ইউনুস নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন নদীর সৌম্য কান্তির দিকে। নদীর পাড়জুড়ে গাছের সারি। গাছের ছায়া

দেখে মনে হলো, সারাদিনের ক্লান্তি তাকে জেঁকে ধরেছে। একটি গাছের ছায়ায় এসে ঘাসের গালিচায় শুয়ে পড়লেন।

শুয়ে শুয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন– আল্লাহ্ পশুপক্ষীদের যেভাবে লালন করেছেন, তাকেও তার প্রয়োজনীয় সবকিছু জোগাবেন। এ কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল হয়ে গেছে। গাছের ডালে ডালে পাখিরা ডাকছে। পাখির কুজনে ঘুম ভেঙে গেলো সাধক ইউনুসের। শুয়ে থেকেই এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখে নিলেন সকালবেলার পৃথিবী। কিন্তু ক্ষুধাক্লান্ত ইউনুসের গাত্রোত্থানের কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। আল্লাহ্ বেহেশত থেকে গায়েবিভাবে তার জন্য খাবার পাঠাবেন, এই ভরসা করে ইউনুস শুয়ে রইলেন। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ওপর তার আস্থা ও নির্ভরতা ছিলো অপরিসীম। তাই ভেবেছিলেন, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে গায়েবি খাবার কীভাবে আসে, তা অনুসন্ধানে তিনি সফল হবেন। কিন্তু একটা দিন একটা রাত কেটে যাওয়ার পরও আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোনো অলৌকিক খাবারের দেখা নেই।

সময় বয়ে চলল। ক্ষুধার তাড়নায় চোখে-মুখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন ইউনুস। নদীর তীরে গাছতলায় শুয়ে শুয়ে সারাটা দিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কি পেটের ক্ষুধার উপশম হয়? গাছের ডালে নাম-না-জানা পাখিদের গান, নদীর স্বচ্ছ পানিতে মাছের বিচরণ দেখতে লাগলেন ক্ষুধাক্লিষ্ট হয়ে। সময়মতো নির্জীব শরীরটা কোনো রকম টেনে নদীর পানিতে অজু করে নামাজ আদায় করে নিলেন।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলো কিন্তু খাবারের কোনো ব্যবস্থা হলো না এখনো। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে নদীর ধারে শুয়ে রইলেন।

বিকেলবেলা আশপাশের বসতির লোকেরা নদীর পাড়ে বেড়াতে এলো। পরনে তাদের ঝলমলে পোশাক। সুসজ্জিত ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তারা এসেছে। তাদের ঘোড়াগুলোর গলায় ঝোলানো ঘণ্টার টুংটাং

আওয়াজ ভেসে আসছে। বিত্তশালীরা রাজকীয় শাহি পাগড়ি পরে ধীর গতিতে ঘোড়ার পিঠে চলেছে। বিত্তহীন পথচারীরা তাদের দেখে সালাম দিচ্ছে। মক্কার পথে কয়েকজন হজযাত্রী পথ চলতে চলতে নদীর কিনারায় এসে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিয়ে আবার ধীর পায়ে মক্কার পথে চলে গেলো। রওনা হবার আগে তারা সঙ্গে নিয়ে আসা থলে থেকে রুটি-কাবাব করে খেয়ে নিলো। নদীর কূলে নেমে আঁজলা ভরে পান করলো ঠান্ডা পানি।

এসব দৃশ্য ইউনুস ইবনে আদম শুয়ে শুয়ে প্রত্যক্ষ করলেন, কিন্তু কারো কাছে দু'মুঠো খাবারের জন্য হাত পাতলেন না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি ভাবলেন– 'এসব কিছুই আল্লাহর পরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়, আল্লাহর রহমতে ভালো একটা ব্যবস্থা হবে।'

রাত নেমে এলো। ক্ষুধার দরুন পায়ে শক্তি নেই। কোনো রকম কষ্টেসৃষ্টে ইউনুস এশার নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর মোরাকাবায় বসলেন। তার পীর ছিলেন একজন উচ্চস্তরের সুফিসাধক, তিনিই তাকে ওজিফা ও মোরাকাবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। মোরাকাবায় বসে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। একান্ত বিনীত হয়ে শুধু তাঁর দিকেই সমস্ত প্রয়োজন পূরণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে নীত হলেন। মোরাকাবায় প্রার্থনা করতে করতেই একসময় ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ফজরের আগেই ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম ভেঙেই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চারদিকে একবার তাকালেন। না, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অলৌকিক খাবার আসেনি। তিনি আশাহত মন নিয়ে অজু করে ফজরের নামাজ আদায় করলেন।

নামাজের পর নদীর কিনারে বসে তাসবিহ পাঠ করতে লাগলেন। নদীর জলে সূর্যের প্রথম আলো পড়ে ঝিকমিকিয়ে উঠলো। মনে হলো সোনালি সোনা কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে নদীর জলে। তরল সোনা ভেসে বেড়াচ্ছে ঢেউয়ের ওপর।

সহসা নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে কী যেন একটা ভেসে আসতে দেখলেন। একটু উৎসুক হয়ে তাকাতেই দেখতে পেলেন– একটা

কাগজের মোড়ক ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে আসছে। ইউনুস ইবনে আদমের মনটা কিছুটা হলেও খুশিতে আনচান করে উঠলো। মোড়কটা ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে কাছে এলে তিনি নদীতে নেমে সেটা তুলে নিলেন।

অভিনব কাগজের মোড়কটা খুলতেই মধুর একটা গন্ধে তার মনটা ভরে উঠল। ইউনুস ভাবলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার জন্য বাগদাদের বিখ্যাত হালুয়া পাঠিয়েছেন। বাদাম, কিশমিশ, গোলাপজল, মধু, সুজি, দুধ আর সুগন্ধি দিয়ে তৈরি হয় এ হালুয়া। বাগদাদি হালুয়া যেমন মূল্যবান, তেমনি তার স্বাদ ও গন্ধও অতুলনীয়। অন্তঃপুরবাসিনী হেরেমের সুন্দরীদের হাতে বানানো; তা না হলে এমন সুন্দর গন্ধ কি কোনো হালুয়ায় থাকে? আরবের বীরযোদ্ধারা যুদ্ধ অভিযানে যাওয়ার সময় এমন হালুয়া সঙ্গে নিয়ে যায়। কারণ, এর মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত জীবনীশক্তি। একবার খেলে দিনভর আর ক্ষুধাভাব দেখা দেয় না।

হালুয়াভরা কাগজের মোড়কটা নিয়ে নদীর কিনারে উঠতে উঠতে ইউনুস ইবনে আদম আপনমনে ভাবলেন– 'হ্যাঁ, এবার আমার ঈমানের পরীক্ষার ফল পেলাম। এমনি করে দৈনিক যদি এতোটা করে হালুয়া নদীর স্রোতে ভেসে আসে অথবা একদিন অন্তরও আসে, তাহলে বুঝতে হবে, আল্লাহর আদেশে আমারই জন্য কোনো স্থান থেকে এই খাবার আসছে। আর তা যদি হয়, তবে আমার কাজ হবে এই বেহেশতি হালুয়া কোথা থেকে আসছে, তার উৎসের সন্ধান করা।'

গাছতলায় বসে তৃপ্তিসহকারে বাগদাদি হালুয়ার পুরোটা খেয়ে নিলেন ইউনুস। সারাদিন বসে রইলেন নদীর ধারে কিন্তু আর কোনো হালুয়ার মোড়ক এলো না নদীর জলে ভেসে। অবশ্য আসবার দরকারও নেই, সকালে যা খেয়েছেন ও দিয়েই একদিন পার করে দেয়া যাবে।

দিন গিয়ে রাত নামল। তিনি প্রতিদিনের মতো নামাজ-মোরাকাবা করে শুয়ে পড়লেন। সকালবেলা ফজরের নামাজের পর নদীর ধারে বসে রইলেন। গত দিনের মতো ঠিক একই সময় কাগজের মোড়কে মোড়া হালুয়া নদীর ঢেউয়ে ভেসে আসতে দেখলেন। খুশিতে আবার তার মনটা ভরে উঠল।

এর পর থেকে এভাবে নিয়ম করে রোজই নদীর জলে ভেসে হালুয়ার মোড়ক আসতে লাগলো আর তিনিও নদীতে নেমে হালুয়ার মোড়ক তুলে নিতে লাগলেন। বেশ কেটে গেলো তিন-চার দিন।

চার দিন যাওয়ার পর ইউনুস ইবনে আদমের মনে নতুন একটা চিন্তা এলো– আল্লাহর বান্দার জন্য কীভাবে আল্লাহ খাদ্য জোগান, তা আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায় এটা। পরিস্থিতি আর পরিবেশকে সহজভাবে নিতে হবে আর প্রকৃতিও একইভাবে কাজ করে যাবে। এটা একটা আবিষ্কার বলে তিনি মনে করলেন। কথায় বলে না– 'যখন তুমি কোনো সত্য জানবে, তখন তা অবশ্যই অপরকে শিক্ষা দেবে।'

কিন্তু পরমুহূর্তেই ইউনুস উপলব্ধি করলেন– তিনি সব সত্যই জানেন না। তিনি একটা সত্য বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছেন মাত্র। এখন পরবর্তী কাজ হচ্ছে, উর্ধ্ব স্রোতের দিকে কোথা থেকে হালুয়ার থলে আসছে, সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছানো। তাহলে তিনি হালুয়ার উৎসস্থলই শুধু জানতে পারবেন না, সেই সঙ্গে এই হালুয়ার উৎপত্তি কীভাবে হচ্ছে আর এর সুস্পষ্ট উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

এবার ইউনুস বেহেশতি হালুয়ার উৎস সন্ধানে নদীর তীর ধরে উজানের দিকে এগোতে লাগলেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নদীর স্রোতে হালুয়ার থলে ভেসে আসতে লাগলো আর যথানিয়মে তিনি ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে লাগলেন।

নদীর কিনার ধরে এভাবে কয়েক দিন হাঁটলেন কিন্তু প্রশ্নের কোনো সুরাহা করতে পারলেন না ইউনুস ইবনে আদম। পাড় ধরে অনেক দূর চলে আসার পরও নদীর বিস্তার সঙ্কুচিত না হয়ে আরো প্রসারিত হতে দেখা গেলো। ইউনুস মনে মনে অবাক হলেন, উর্ধ্বমুখে নদী ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে আসে; তা না হয়ে নদী ক্রমশ চওড়া হচ্ছে কেন?

আরো কিছু দূর অগ্রসর হলে ইউনুস দেখলেন–সামনে নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপ। শ্যামল বনানী শোভিত সেই দ্বীপের মাঝখানে একটা বিশাল সুরক্ষিত প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। ইউনুস ভাবলেন, এতোক্ষণে তাহলে বেহেশতি হালুয়ার উৎসস্থল আবিষ্কার করা গেলো!

নিশ্চয় ওই প্রাসাদ থেকেই প্রতিদিন হালুয়ার মোড়ক ফেলা হয় নদীতে আর সেটাই ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে নদীর স্রোতে।

নদীর মাঝখানে দ্বীপটা দেখে ইউনুস থমকে দাঁড়ালেন– এখন রহস্য সমাধানের জন্য নদীর মধ্যে দ্বীপের ওই প্রাসাদটায় যাওয়ার উপায় কী? নদীর পাড়টা জনমানবহীন, কোনো নৌকা বা পারাপারের ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে না। তীরে এসেই তবে কি তরি ডুববে? যে রহস্য সমাধানের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এলেন, এখন রহস্যের দোরগোড়ায় এসে কি তবে তিনি বিফল হবেন?

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে এসব ভাবছিলেন, এমন সময় সহসা এক দরবেশ এসে তার সামনে দাঁড়ালেন। পরনে তার লম্বা আলখেল্লা, বাবরি চুল, হাতে তসবিহ, গায়ে আতরের ঘ্রাণ।

দরবেশকে দেখেই ইউনুস ইবনে আদম তাকে সালাম দিলেন– 'আসসালামু আলাইকুম দরবেশ বাবা!'

সালামের উত্তর দিয়ে দরবেশ উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আল্লাহর আশেক হও, বাবা! এখানে কী দরকারে আসা হয়েছে?'

ইউনুস দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'একটা গোপন প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছি। এখানে এসে সামনের এই প্রাসাদটা দেখতে পাচ্ছি। আপনি সম্ভবত জানেন, কীভাবে ওই প্রাসাদে পৌঁছাতে হবে!'

দরবেশ জবাব দিলেন, 'তুমি তো বাবা এই প্রাসাদ সম্পর্কে কিছুই জানো না। প্রাসাদ সম্পর্কে তোমার খুব আগ্রহ রয়েছে দেখছি। তাহলে বলি, শোনো– ওই প্রাসাদে এক শাহজাদি বাস করে। যাকে এক প্রতাপশালী বাদশাহ তার রাজ্য থেকে হরণ করে এই দ্বীপপ্রাসাদে বন্দী করে রেখেছে। অসংখ্য সুন্দরী দাসী তার সেবায় নিয়োজিত, তবু সে শাহজাদি আদৌ সুখী নয়। কারণ, সে বিজয়ী বাদশাহকে বিবাহ করতে রাজি নয়। শাহজাদির এমন জেদের কারণেই বাদশাহ তাকে এখানে নির্বাসনে রেখেছেন। প্রাসাদ পাহারার জন্য দুর্লঙ্ঘ্য সব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছেন তিনি, দারুণ সুরক্ষিত এ প্রাসাদ। যাতে সে এখান থেকে পালাতে না পারে। সেসব প্রতিবন্ধকতা খালি চোখে দেখা যায় না। তুমি

তো বাবা প্রাসাদের কাছে যেতে পারবে না আর ওর মধ্যে কী রয়েছে, তা-ও জানতে পারবে না।'

ইউনুস এবার বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন না, বাবা?'

দরবেশ হেসে বললেন, 'আমি আল্লাহর রাহে উচ্চতর সাধনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। যা হোক, আমি তোমাকে একটা অজিফা দিয়ে যাচ্ছি, এই অজিফা বারবার পড়বে আর মোরাকাবায় থাকবে। তারপর তুমি যোগ্যতা অর্জন করলে এক অদৃশ্য শক্তি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে। একটা জিন এসে ওই প্রাসাদের চারপাশে যে জাদুর বেষ্টনী রয়েছে, তা ভেঙে তোমাকে প্রাসাদের মধ্যে যাওয়ার পথ করে দেবে। আল্লাহ তোমাকে কামিয়াব করুন। খোদা হাফেজ।'

এ কথা বলে দরবেশ 'আল্লাহু আল্লাহু' জিকির করতে করতে গন্তব্য পথে রওনা হলেন।

দরবেশ চলে যেতেই ইউনুস ইবনে আদম নদীর কূলে বসে তার দেয়া অজিফা পাঠ করতে লাগলেন। বেশ কয়েক দিন এভাবে কেটে গেলো। অজিফা পাঠ করা আর বেহেশতি হালুয়ার প্রত্যাশায় থাকা– দৈনন্দিন এই হলো ইউনুসের কাজ। সারাদিন নদীর তীরে বসে বসে তিনি প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে আনমনে অদ্ভুত সব চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন।

এমনিভাবে একদিন ইউনুস মিয়া হালুয়ার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। বিকেল শেষ হওয়ার পথে। পড়ন্ত সূর্যটা যখন প্রাসাদের উঁচু মিনারের পাশ ঘেঁষে ডুবে যাচ্ছিল, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য তার চোখে পড়লো। দেখলেন, এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী প্রাসাদের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো। সুন্দরীর সৌন্দর্য চোখ ঝলসানো। হাতে একটা মোড়ক নিয়ে সুন্দরী পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকালো। সূর্যের অবস্থানে সন্তুষ্ট হয়ে হাতের মোড়কটি ছুড়ে ফেললো নদীর বুকে। মেয়েটি মোড়ক ছুড়ে দিয়েই আবার প্রাসাদ অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেলো। মোড়কটি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে নদীতে এসে পড়লো। স্রোতের টানে ভাসতে লাগলো অজানার উদ্দেশে।

ইউনুস ইবনে আদম এতোক্ষণে বেহেশতি হালুয়ার রহস্য অনুধাবন করতে পারলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠলেন– 'বেহেশতি হালুয়ার উৎস পেয়ে গেছি।'

ইউনুস ইবনে আদম আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, অবশেষে তিনি বেহেশতি হালুয়ার রহস্য উদ্ঘাটনের সাফল্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। দরবেশ-প্রদত্ত অজিফার বলে তিনি সত্বরই জিনের বাদশাহর সাহায্য পেয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তরে যেতে পারবেন আর ওই শাহজাদি এবং তার বাগদাদি হালুয়া ফেলার রহস্যও জানতে পারবেন। তখনই সকল রহস্যের দ্বার তার কাছে খুলে যাবে।

সাধক ইউনুস এই কথা মনে মনে যখন ভাবছেন, তখন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেলো। ইউনুস বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলেন, তিনি আচমকা বাতাসের মধ্য দিয়ে সশরীরে আকাশের দিকে উঠছেন আর চোখের পলকে এক স্বপ্নময় প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করছেন। সেখানে রয়েছে বহু সুন্দরী অশরীরী কায়া–জিনের রাজত্ব।

এ সময় এক ছায়ামানবের আবির্ভাব হলো। তিনি বললেন, 'আমি জিনের বাদশাহ। আমি আপনাকে উর্ধ্বাকাশে আমার প্রাসাদে তুলে এনেছি। কারণ, বড় বড় আউলিয়া-দরবেশ আপনাকে যেসব মহান অজিফা করতে নির্দেশ করেছেন, তারই প্রভাবে আপনার সেবায় আমি নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়েছি। এখন বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

ইউনুস ইবনে আদম প্রথমে জিনের অবয়ব দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলেন। কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'হে জিনদের নেতা! আমি সত্যের অনুসন্ধানী। আমি নদীর কিনারে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার কাছাকাছি দ্বীপের মধ্যে যে প্রাসাদটা আছে, তার মধ্যেই রয়েছে আমার সত্যের রহস্য। কিন্তু ওই প্রাসাদে কেউ যেতে পারে না, জাদুবলে ওটার চারদিকে বেষ্টনী দিয়ে রাখা হয়েছে। আমাকে ক্ষমতা দিন, যাতে আমি সেই প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারি এবং সেখানে বন্দিনী শাহজাদির সঙ্গে কথা বলে আমার রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পারি।'

জিনের বাদশাহ বললেন, 'বেশ, তা-ই হবে। তবে একটা বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছি। যে মানুষের যতোটুকু বুঝবার যোগ্যতা আছে, সে ঠিক ততোটুকুই বুঝতে পারে। কোনো সত্য বুঝবার মতো প্রস্তুতি যে যতোটুকু অর্জন করেছে ততোটুকুই সে বুঝতে পারবে।'

সাধক ইউনুস বললেন, 'সত্য চিরকালই সত্য এবং সত্য বুঝবার ক্ষমতা আমার রয়েছে, সে সত্য যে রকমই হোক না কেন। যাহোক, এখন আমাকে প্রাসাদে প্রবেশের ক্ষমতা দিন।'

এ কথার পর ইউনুস মিয়া দেখলেন, তার দেহটা যেন ইথারে অদৃশ্য হয়ে গেছে আর কয়েকটা জিন তাকে নিয়ে চললো সেই প্রাসাদটার দিকে। জিনের বাদশাহ ইউনুসের হাতে একটা স্বচ্ছ পাথরের আয়না দিয়ে বলে দিয়েছিলেন, আয়নাটা প্রাসাদের দিকে ধরলে প্রাসাদে প্রবেশের পথে অদৃশ্য সব জাদুর জাল চোখে পড়বে। তখন জিনেরা তাদের অলৌকিক ক্ষমতায় সব বাধা ছিন্ন করে তাকে প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে যাবে। প্রাসাদের সামনে এসে ইউনুস তা-ই করলেন। জিনেরা তাকে প্রাসাদের মধ্যে যাবার পথের সকল বাধা অলৌকিক শক্তিবলে অপসারণ করে দিলো।

আশ্চর্য হয়ে গেলেন ইউনুস ইবনে আদম। তিনি দেখলেন, নদীর ওপর দিয়ে একটা সেতু সোজা প্রাসাদের তোরণ পর্যন্ত চলে গেছে। ইউনুস সেতু পার হয়ে দ্রুতপায়ে প্রাসাদের ফটকে গিয়ে পৌঁছানোর সাথে সাথে ফটক পাহারারত একজন সান্ত্রি তাকে তখনই শাহজাদির কক্ষে নিয়ে এলো।

শাহজাদি ইউনুসকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'আপনি এই প্রাসাদে প্রবেশের সব বাধা অপসারণ করে আমাকে বন্দিনী দশা থেকে মুক্ত করেছেন, এ জন্য আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমি এবার আমার পিতার কাছে ফিরে যেতে পারবো। এবার বলুন, কী পেলে আপনি খুশি হবেন। আপনি যা চাইবেন, তা-ই আপনাকে দেবো। বলুন, কী চান?'

ইউনুস মিয়া তাৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'আমি একটিমাত্র জিনিসই চাই, তা হচ্ছে সত্য। প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, তিনি যে সত্যকে জেনেছেন তা অন্যকে জ্ঞাত জানানো। যাতে তা থেকে অন্যরা উপকৃত হতে পারে। মুহতারমা শাহজাদি! যে সত্যটা আমার জানা প্রয়োজন, তা আমাকে জানালেই আমি খুশি হবো।

শাহজাদি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'বলুন, কী এমন সত্যের বিষয় আপনি জানতে চান, যা আমার জানা আছে। আমি অবশ্যই সানন্দে তা আপনাকে জানাবো।'

ইউনুস ইবনে আদমের মনে উত্তেজনা বিরাজ করছে– অবশেষে তিনি রিজিকের ব্যাপারে সত্যের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। যে রিজিকের উৎস সন্ধানে তিনি পথে নেমেছিলেন, আজ সেই সত্য তার সামনে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।

তিনি খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'শোকরিয়া শাহজাদি! এখন বলুন তো, আপনি কার আদেশে এবং কীভাবে সুমিষ্ট বাগদাদি হালুয়া প্রতিদিন আমার জন্য বিশেষ ধরনের মোড়কে করে নদীতে নিক্ষেপ করতেন? কার আদেশে আপনি এমন অত্যাশ্চর্য হালুয়া রোজই আমার জন্য নদীতে ফেলে দিতেন? কেন?

শাহজাদির কপালে কুঞ্চন দেখা দিলো। তিনি হালুয়ার বিষয়টি বুঝতে খানিকটা সময় নিলেন। যখন বুঝতে পারলেন ঘটনা আসলে কী ঘটেছে তখন একটুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'আপনি যে হালুয়ার কথা বলছেন, যা আমি প্রতিদিন নদীতে ফেলে দিয়ে থাকি, সেটা আসলে বাস্তবিকপক্ষে হালুয়া নয়। ওগুলো হচ্ছে আমার শরীরে মাখানো প্রসাধনী। শরীরের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য প্রতিদিন আমি সুগন্ধি প্রসাধনী আর গাধার দুধ গোসলের সময় সারা দেহে মেখে নিতাম। গোসল শেষ হলে প্রসাধনী, গাধার দুধ আর ময়লাগুলো একটা মোড়কে করে নদীতে ফেলে দিতাম। এই হলো আপনার বাগদাদি বেহেশতি হালুয়ার রহস্য।'

সাধক ইউনুস ইবনে আদম কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। অনেক কষ্টে কোনোমতে একটা ঢোঁক গিলে বললেন, 'অবশেষে আমি সত্যটা

জানলাম। মানুষের সমঝোতা ও উপলব্ধিটা শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার। মানুষের যোগ্যতার পরিধির অনুপাতেই সে বুঝতে সক্ষম হয়। আপনার কাছে যেটা প্রসাধনী মিশ্রিত গাত্র-মার্জনী, আমার কাছে তা বেহেশতি হালুয়া হয়ে ধরা দিয়েছে। ভালো থাকুন, শাহজাদি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।'

এ কথা বলেই সাধক ইউনুস আবার অজানার উদ্দেশে পা বাড়ালেন।

উৎস সূত্র : *এ গল্পের নায়ক মুহাম্মদ ইউনুস। সিরিয়ার অধিবাসী। তিনি ছিলেন সুফি সাধক। একাধারে রোগের চিকিৎসক ও আবিষ্কারক। ১৬৭০ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।*

বেহেশতি হালুয়া গল্পের কথক হচ্ছেন হালকাভি। সাধক মুহাম্মদ ইউনুস অথবা তার পীর অপর কোনো সুফি দরবেশ এই গল্পের রচয়িতা কি না, তা জানা যায়নি।

প্রিয় ক্রীতদাসী

বাদশাহর হেরেমে তো ক্রীতদাসীর কমতি নেই। সবাই সুন্দরী, রূপসী। হেরেমের অন্দর তারা উজালা করে রাখে তাদের রূপ আর জৌলুশের বিভায়। শুধু রূপ নয়, গুণেও তারা একেকজন অনন্য। শাহি প্রাসাদের দাসী তারা, রাজ্যের সবচেয়ে গুণবতী-রূপবতী না হলে তো আর শাহি দাসী হতো না!

এতো রূপ-সৌন্দর্য থাকার পরও প্রাসাদের দাসীদের মন ভালো নেই। ভালো থাকবেই-বা কী করে! বাদশাহ যে তাদের তেমন সময়ই দেন না। তাদের সঙ্গে বসে হাসিমুখে গল্প করেন না। তাদের সঙ্গে রাজ্যের সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ করেন না। তাদের সঙ্গে কারণে-অকারণে খুনসুটি করেন না। সবই করেন শুধু একজনের সঙ্গে।

একজনের সঙ্গে? কে সে? বাদশাহর নতুন বেগম বুঝি?

উঁহু, সে-ও রাজপ্রাসাদের একজন নগণ্য দাসীই। আর সবার মতোই বাজার থেকে কিনে আনা ক্রীতদাসী। কিন্তু তা হলে কী হবে, বাদশাহ প্রতিদিন তাকে সময় দেন। তার সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেন। তাকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। সে যা-ই করে বাদশাহর তা-ই যেন ভালো লাগে।

আর এসব কারণেই প্রাসাদের অন্য দাসীরা ওই দাসীকে একদমই দেখতে পারতো না। দারুণ হিংসে করতো তাকে। আড়ালে-আবডালে

তাকে নিয়ে যাচ্ছেতাই বলাবলি করতো। কিন্তু বাদশাহ বা ওই দাসীর সামনে কিছু বলার সাহস পেতো না। তাতে যদি আবার হিতে বিপরীত হয়ে যায়!

বাদশাহ অন্য দাসীদের এমন হিংসার ব্যাপারটি ভালোই বুঝতেন। তারা সবাই যে তার প্রিয় ক্রীতদাসীকে দু'চোখে দেখতে পারে না, তা তাদের চোখ দেখেই পড়ে ফেলতে পারতেন। এ কারণে বিষয়টির সুরাহা করতে মনে মনে একটি ফন্দি আঁটলেন।

একদিন বাদশাহ রাজপ্রাসাদের সকল দাসীকে দরবারে ডাকলেন। সবাইকে দরবারে ডাকার কারণে দাসীরা হকচকিয়ে গেলো। সব দাসীকে একসঙ্গে দরবারে ডাকা তো খুব ভালো লক্ষণ নয়। বাদশাহ কি তাদের হিংসার ব্যাপারটি বুঝে ফেলেছেন? প্রিয় দাসী কি তাদের ব্যাপারে বাদশাহর কাছে নালিশ করেছে?

এসব ভাবতে ভাবতেই তারা দরবারে হাজির হলো। সবার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। এখনো কেউ কিছু বুঝতে পারছে না কেন তাদের দরবারে ডাকা হয়েছে।

বাদশাহ দাসীদের চোখে ভয়ের ছাপ দেখে তাদের অভয় দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, আমি তোমাদের একটি জরুরি বিষয় বোঝানোর জন্য ডেকেছি। বিষয়টি হলো, আমি পারস্যের বাজার থেকে দামি অনেকগুলো পেয়ালা কিনে এনেছি। পেয়ালাগুলো স্বচ্ছ স্ফটিকের তৈরি। স্ফটিকের কিনারায় মুক্তো ও দামি পাথরের কারুকাজ করা আছে। পেয়ালাগুলো তোমাদের সবার পেছনে রাখা আছে। তোমরা সবাই একটি করে পেয়ালা হাতে নাও।

বাদশাহর কথায় দাসীরা একটি করে পেয়ালা তুলে নিলো। অদ্ভুত সুন্দর পেয়ালাগুলো। স্বচ্ছ স্ফটিক কেটে কেটে নিখুঁত কারুকাজ করে বসানো হয়েছে গোলাপি মুক্তো ও রঙবেরঙের দামি পাথর। পেয়ালাগুলো হাতে নিয়ে সেগুলোর দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে রইলো দাসীরা।

সবার হাতে পেয়ালা দেখে বাদশাহ বললেন, 'তোমাদের হাতের পেয়ালাগুলো দেখতে অতীব সুন্দর হলেও এগুলো এখন আমার প্রয়োজন

নেই। আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকের হাতে নেয়া পেয়ালাগুলো এখনই মেঝেতে ছুড়ে ভেঙে ফেলবে।'

ক্রীতদাসীরা প্রথমে বাদশাহর কথার মর্মার্থ বুঝতে পারলো না। যখন বুঝলো তখন মনে করলো, বাদশাহ তাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। এতো সুন্দর দামি পেয়ালা কেউ ভাঙে নাকি? তারা ঠোঁট টিপে হেসে একে অপরের দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।

বাদশাহ আবার তাগাদা দিলেন, 'কই, ছুড়ে ফেলো পেয়ালাগুলো।'

দাসীরা এবার ভাবলো, নিশ্চয় বাদশাহর মাথা খারাপ হয়েছে। নইলে এমন দামি জিনিস কোনো বাদশাহ ভেঙে ফেলতে বলতে পারেন? দু-একজন তো প্রতিবাদই করে উঠলো।

বাদশাহ হাত উঠিয়ে তাদের নিবৃত্ত করলেন। এবার হাত ইশারায় ডাকলেন তার সেই প্রিয় ক্রীতদাসীকে। সে বাদশাহর সামনে আসতেই বাদশাহ তাকে একটি পেয়ালা উঠিয়ে সেটাকে মেঝেতে ছুড়ে ফেলতে বললেন।

বাদশাহর বলতেই যা দেরি, দাসীটি একটি পেয়ালা উঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ছুড়ে মারলো। মুহূর্তে ঝনঝন শব্দে ভেঙে চৌচির হয়ে গেলো মুক্তোখচিত দামি পেয়ালাটি। দরবারের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো ভাঙা কাচের টুকরো, মহামূল্যবান মুক্তো ও পাথর।

তার এমন অপরিণামদর্শী কাজে দারুণ ক্ষুব্ধ হলো অন্যসব দাসী। দু-একজন এগিয়ে এসে তাকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগলো, 'এ কী করলে তুমি? এমন দামি একটি মুক্তোর পেয়ালা কোনো কিছু চিন্তা না করে মুহূর্তেই ভেঙে ফেললে! ভাঙার আগে তোমার তো একবার চিন্তা করার প্রয়োজন ছিলো। তুমি সারাজীবন তপস্যা করলেও কি এমন একটি পেয়ালা কিনতে পারবে? তোমার মতো একজন ক্রীতদাসীর চেয়ে এই পেয়ালার দাম বেশি ছিলো, এটা কি তুমি বুঝো? তোমার মতো একজন দাসী আর বুঝবেই বা কী!'

বাদশাহ চুপ করে দাসীদের কাণ্ড দেখছিলেন। এবার তিনি হাত উঁচু করে সবাইকে থামতে বললেন। সবাই নীরব হলে বাদশাহ বললেন,

'আমি আজকে তোমাদের একটি পরীক্ষা নিলাম। পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এবার তোমরা আমার এই প্রিয় ক্রীতদাসীর কাছ থেকে শোনো কেন সে এমন দামি একটি পেয়ালা বিনা বাক্যব্যয়ে ভেঙে ফেললো।'

সকল দাসী তাকালো সেই দাসীর দিকে। ক্রীতদাসীর মনে কোনো ভয় নেই, তার গলার আওয়াজে কোনো সংকোচ নেই। সে বলতে লাগলো– 'বাদশাহ আমার মুনিব, আমার মালিক; আমি তার সামান্য ক্রীতদাসী মাত্র। আমার কাজই হচ্ছে তার সকল আদেশ মান্য করা। তিনি আমাকে পেয়ালা ভাঙার আদেশ দিয়েছেন, আদেশ পালন করাই আমার দায়িত্ব। তিনি যদি আমাকে এই প্রাসাদ ভাঙার আদেশও দেন, তবে সেটা পালন করাও আমার দায়িত্ব। আমি তো মাত্র একটি পেয়ালা ভেঙেছি। তিনি এ রাজ্যের বাদশাহ, ইচ্ছে করলেই এমন হাজারো পেয়ালা একদিনের মধ্যে তৈরি করে নিতে পারবেন। কিন্তু একবার যে আদেশ দিয়েছেন, সেটা যদি আমি পালন না করি, তবে সে আদেশ পালনের সুযোগ আমার জীবনে আর আসবে না। বাদশাহর একটি আদেশ আমার কাছে হাজারও মুক্তোর পেয়ালার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বেশি প্রিয়।'

লজ্জায়, অনুশোচনায়, গ্লানিতে অন্য ক্রীতদাসীদের মাথা নিচু হয়ে গেলো। কারো মুখে এখন আর কোনো কথা নেই। সকলেই বুঝতে পারলো তারা এতোদিন কী ভুল করেছে। মনে মনে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য নিজেদেরই গালমন্দ করতে লাগলো তারা।

বাদশাহ সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন হয়তো তোমরা বুঝতে পেরেছো কেন আমি আমার এই প্রিয় ক্রীতদাসীকে এতো ভালোবাসি।'

ঈদের আনন্দ

আগামীকাল ঈদ। আগের দিন সন্ধেবেলা।

মাগরিবের নামাজের পরপরই দামেস্কের অলি-গলিতে নামলো শিশু-কিশোরদের ঢল। সবাই তাকিয়ে আছে পশ্চিম দিগন্তপানে। কখন দেখা যাবে শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ!

'ওই তো চাঁদ'- কেউ একজন চিৎকার করে উঠতেই দামেস্কজুড়ে খুশির হিল্লোল বয়ে গেলো। সবাই তাকিয়ে দেখলো দিগন্তে ছোট্ট এক ফালি চাঁদ উঠেছে। বাঁকা কাস্তের মতো রুপালি চাঁদ।

একটু পর সবার হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল জাগিয়ে দিয়ে তা আবার হারিয়ে গেলো। ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেলো আসন্ন ঈদের প্রস্তুতি। দিকে দিকে নতুন কলরব। ফুলকুঁড়ির মতো ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দের গান গেয়ে ঈদকে স্বাগত জানাচ্ছে। পুরো দামেস্ক যেন খুশির ফোয়ারায় ভাসছে এখন।

এমনই আনন্দঘন মুহূর্তে মুসলিম জাহানের খলিফা আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনে আবদুল আজিজের মাসুম ছেলেটি দৌড়ে এলো তার মায়ের কাছে। এসেই মায়ের আঁচল ধরে কাঁদতে লাগলো সে। মা ছোট্ট ছেলের কান্না দেখে চিন্তিত হলেন। কোমল হাতে ছেলের মাথাটা তুলে ধরলেন। উড়নার আঁচল দিয়ে তার অশ্রুভেজা চোখ দুটো মুছে দিলেন। ছোট্ট উজ্জ্বল কপালে আদরের চুমু খেয়ে মায়াভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে বাবা! কাঁদছো কেন?

উঁহু! ছেলে কিছু বলছে না। তার কান্নাও থামছে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে। মা আবারও আদর করে স্নেহের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার লক্ষ্মীসোনা, কী হয়েছে তোমার? বলো আমাকে। রোজার কারণে তুমি এমন ছটফট করছো? তোমাকে তো আমি বারবার রোজা রাখতে নিষেধ করেছিলাম। তোমার বয়সই বা কতো হয়েছে, এতো ছোট্ট মানুষ রোজা রাখলে তো কষ্ট হবেই। কিন্তু আমার এ নিষেধ তুমি কবেই-বা শুনলে?'

ছেলে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, 'আম্মু, রোজার কথা তো আমার মনেই ছিলো না, তাতে আবার কষ্ট কিসের? আমি রোজার কারণে কাঁদছি না।'

মা আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'সোনামানিক আমার, তাহলে কী হয়েছে তোমার, কেন এভাবে কাঁদছো তুমি? আগামীকাল ঈদ, আনন্দের দিন। সবাই আনন্দ করছে। কাল তোমার আব্বুর সাথে ঈদগাহে যাবে। কতো আনন্দ হবে। সবাই আনন্দ করছে। আর তুমি কিনা চাঁদরাতে কাঁদছো?'

ছেলে চোখভরা অশ্রু নিয়ে উত্তর দিলো, 'কাল ঈদ, সে জন্যই তো কাঁদছি। কাল ঈদের দিন জাফর, আব্বাস, খালেদ, ইকরামসহ আমার সব বন্ধু নতুন নতুন জামা-কাপড় পরে ঈদগাহে যাবে। আর আমার আব্বু বলেন, আমার পুরনো জামাকাপড়গুলোই ভালোভাবে ধুয়ে দেয়া হবে, নতুন জামাকাপড় কিনে দেয়া হবে না। আম্মু, তাহলে কিন্তু আমি ঈদগাহেই যাবো না।'

কথাগুলো বলে আমিরুল মুমিনিনের ছোট্ট ছেলেটি আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। ছেলের অবিরাম কান্না দেখে মায়ের চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'না বাবা, তা কী করে হয়! ঈদের দিনে তুমি নতুন জামাকাপড় পরবে না তো পরবে কে? তুমি আর একটুও কেঁদো না। একটু সবর করো, তোমার আব্বু আসুক। তোমার আব্বুকে বলবো, যে করে হোক তোমার জন্য জামাকাপড় কিনে আনতে।'

ছেলের মুখে এবার হাসি। মায়ের আশ্বাস শুনে ছেলের ছোট্ট হৃদয়খানি খুশিতে ভরে উঠলো। মুহূর্তেই চোখে-মুখে তার আনন্দের রেখা ফুটে উঠলো। অধীর আগ্রহে সে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে লাগলো, কখন তার আব্বু আসবে।

অর্ধপৃথিবী শাসন করা আমিরুল মুমিনিন উমর বিন আবদুল আজিজ প্রশাসনিক কাজে ঘরের বাইরে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর সেদিনকার রাজ্য পরিচালনার দায়দায়িত্ব পালন করে ঘরে ফিরলেন। ঘরে ফিরে একটু সুস্থির হলে জীবনসঙ্গিনী তাকে ভয়ে ভয়ে বললেন ছেলের মর্জির কথা- 'আগামীকাল তো ঈদ। নতুন জামাকাপড় পরে সবার ছেলেমেয়েরা ঈদগাহে যাবে, কিন্তু আমাদের ছোট্ট ছেলেটি পুরনো পোশাক পরে যাবে, এটা কেমন কথা! তাছাড়া ও তো ভীষণ রকম জেদ ধরে বসেছে। এখন যে করে হোক, ওর নতুন জামাকাপড়ের ব্যবস্থাটা করতেই হয়।'

আমিরুল মুমিনিন মনোযোগ দিয়ে স্ত্রীর কথাগুলো শুননলেন। এরপর কিছুটা শান্তস্বরে উত্তর দিলেন, 'ফাতেমা! তুমি কি জানো না আমার দৈনন্দিন পারিশ্রমিক মাত্র দুই দিরহাম। এ স্বল্প আয়ে সংসার চালানো তো কঠিন, ছেলেকে নতুন জামাকাপড় বানিয়ে দিই কীভাবে।'

স্ত্রী বললেন, 'কিন্তু আমিরুল মুমিনিন, ছেলে যে জেদ ধরে বসেছে। ও তো এসব বুঝবে না।'

আমিরুল মুমিনিন বললেন, 'তবে আর কী করা, তোমার ব্যবহারে যদি কোনো গয়নাপত্র থেকে থাকে, তাহলে তা বিক্রি করে ছেলের জেদ লাঘব করো।'

স্ত্রী উত্তর দিলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আপনি যেদিন খেলাফতের আসনে আরোহণ করেছেন, সেদিন থেকেই তো আপনি আমার ব্যবহারের এক-একটি গয়না খুলে খুলে বায়তুল মালে জমা দিয়ে এসেছেন। বলেছেন, এগুলো নাকি বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে তৈরি। আর বায়তুল মাল হচ্ছে গরিব মিসকিনদের হক। সুতরাং, এখন আর আমার কাছে গয়নাগাটি আসবে কোত্থেকে?'

আমিরুল মুমিনিন মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। এরপর মাথা তুলে একটা ছোট্ট চিরকুট লিখে বাড়ির নওকরের হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে বায়তুল মালের খাজাঞ্চির কাছে দেবে। এর উত্তরে সে যা দেয়, সেটা খুব যত্নসহকারে নিয়ে আসবে।'

কিছুক্ষণ পরে নওকর ফিরে এলো। পত্রের জবাবে সে-ও পত্র নিয়ে এসেছে। খাজাঞ্চি পত্রের জবাবে লিখেছেন–

'আমিরুল মুমিনিন! আপনার নওকর আপনার নির্দেশ ঠিকমতোই পালন করেছে। কিন্তু কী করে আমিরুল মুমিনিনের এক মাসের বেতন আগাম দিয়ে দিতে পারি? খলিফাতুল মুসলিমিনের আগামী এক মাসের হায়াতের কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? তাহলে জনাব কী করে গরিব-মিসকিনদের এই হক অগ্রিম নিয়ে নেবেন?'

খাজাঞ্চির পত্র পড়ে আমিরুল মুমিনিন যেন নতুন সংবিৎ ফিরে পেলেন। আবেগ বিহ্বলের মতো বলে উঠলেন, 'আল্লাহর শপথ! খাজাঞ্চি আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।'

পরদিন ঈদের আমেজ নিয়ে ভোরের আকাশে নতুন সূর্য উদিত হলো। চারদিকে হরেক রকম ফুলের সুবাস ছড়িয়ে প্রভাতের হাওয়া বইতে লাগলো জগৎময়। বাতাসে যেন আনন্দের বৃষ্টি ঝরছে। শিশুদের গানে গানে মুখরিত আকাশ-বাতাস। দিকে দিকে 'ঈদ মুবারক... ঈদ মুবারক' ধ্বনির অপূর্ব কলরব। দুঃখী-দরিদ্র মানুষেরাও আজ নতুন আনন্দে মেতে উঠেছে। বিষণ্ন থেকে বিষণ্নতার মানুষও যেন আজ ক্ষণিকের জন্য বিষণ্নতার বন্দিশালা হতে মুক্তি পেয়েছে। দামেস্কের বাজার আজ নতুন সাজে সজ্জিত। ঝলমলে সেই বাজারের পথ ধরে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে পথ চলছে শিশু-যুবা ও বৃদ্ধ মানুষের দল। সবাই তারা ঈদগাহের দিকে যাচ্ছে।

সেই পথ ধরে একই সাথে হাঁটছেন খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ আর তার সেই ছোট্ট ছেলেটি। ছেলেটির গায়ে নেই কোনো নতুন পোশাক, নেই ঈদের সাজসজ্জা, নেই কোনো আড়ম্বরতার ছাপ। তবুও যেন আনন্দের কোনো কমতি নেই তাদের।

সারা রাত খলিফাতুল মুসলিমিন তাকে বুঝিয়েছেন। ছোট্ট ছেলেকে আদর করে বলেছেন, এই দুনিয়ার যারা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে জীবন যাপন করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় পুরনো কাপড়চোপড় পরেই আনন্দিত থাকে; মহান আল্লাহ পরকালে তাকে বেহেশতে নতুন দামি রেশমি পোশাক পরতে দেবেন, যা হবে দুনিয়ার সকল পোশাক-আশাকের চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর।

সেই বেহেশতি আশ্বাস ছেলের হৃদয় থেকে মুছে দিয়েছে সব দুঃখ আর না পাওয়ার শোক। এক স্বপ্নীল বেহেশতি ঈদের আনন্দে ভরে উঠেছে তার হৃদয়মন। হৃদয়জুড়ে তার দোলা দিয়ে গেছে এক অব্যক্ত বেহেশতি পুলক-হিল্লোল। সে এখন তার পিতা আমিরুল মুমিনিনের বলে দেয়া সেই বেহেশতের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে।

নতুন সম্রাট

সম্রাটের বাবুর্চি যেনতেন বাবুর্চি নয়, দেশের নামকরা বাবুর্চি তিনি। তার নাম নিয়ে ডেগের মধ্যে শুধু পানি ছেড়ে দিলেও তৈরি হয়ে যায় সুস্বাদ কোনো পায়েস। হায়দারাবাদি বিরিয়ানি, ইরানি কোপ্তা, আফগানি পোলাও, মোগলাই রেজালা, মাদ্রাজি দোপেঁয়াজা, মুলতানি কোরমা, ঢাকাই ফিরনিসহ আরো হাজারো পদ তার নখদর্পণে। শুধু একবার হুকুম করলেই হয়, খাবারের দস্তরখানে হাজির হয়ে যাবে কমপক্ষে পনেরো-বিশ পদের শাহি সব খাবারের আয়োজন। সাধারণ প্রজারা তো বটেই, দুনিয়ার অনেক রাজা-বাদশাহও এমন খাবারের কথা কল্পনা করতে পারেন না। তিনি দিল্লির মোগল শাহিমহলের বাবুর্চি!

বহু বছর ধরে তিনি শাহিমহল্লের প্রধান বাবুর্চির পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। কতো সম্রাট, রাজা-উজির, মন্ত্রী-সেনাপতি তার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। শাহিমহলের বেগম, শাহজাদা-শাহজাদি আর সব রাজস্বজনের প্রতিদিনকার খাবারের আয়োজন তিনিই করে আসছেন এতোদিন। বিশেষ করে সম্রাট কী খাবেন না-খাবেন, কখন খাবেন, কোথায় খাবেন–এসব বিষয়ও তিনিই দেখভাল করে থাকেন। সম্রাটের একান্ত পাঁচক তিনিই।

কিন্তু তিনি আর শাহিমহলে বাবুর্চি হিসেবে থাকবেন না। সম্রাটের জন্য তিনি আর খাবার রান্না করতে আগ্রহী নন। সম্রাটের নওকরি ছেড়ে

তিনি অন্য কোথাও চাকরি খুঁজে নেবেন। শাহিমহলে সম্রাটের রান্না করে তার আর পোষাচ্ছে না।

কিন্তু কেন হঠাৎ এমন আচানক সিদ্ধান্ত? দিল্লির শাহিমহলে সম্রাটের জন্য খাবার রান্না করার চাইতে উমদাহ্ চাকরি আর কী হতে পারে? কতো সম্মান, কতো মাসোহারা-উপঢৌকন, কতো প্রশংসা...। তবুও তিনি শাহিমহলের চাকরি ছেড়ে দিতে চান? লোকটার হলো কী?

ঘটনা হলো, দিল্লির সিংহাসনের আগের সম্রাট গত হওয়ার পর তার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করার পরপরই বাবুর্চিকে একদিন ডেকে বললেন, আপনি আমার ব্যক্তিগত বাবুর্চি। আজ থেকে আপনার প্রতি হুকুম হলো– আমার জন্য কেবল দু'বেলা খাবারের আয়োজন করবেন। একবেলা শুধু চাল ও ডালসহযোগে সাধারণ খিচুড়ি, আরেক বেলা তিনটে আটার রুটি সেঁকে দেবেন, সঙ্গে ডাল বা সবজি হলেই চলবে। ব্যস, আর কিছু নয়।

বাবুর্চি নতুন সম্রাটের কথা শুনে প্রথমে অবাকই হলেন। মনে মনে ভাবলেন, সম্রাট হয়তো ঠাট্টা করছেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন, সম্রাট সত্যি সত্যিই খিচুড়ি আর আটার রুটি খাবেন প্রতিদিন, তখন বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। সম্রাটের সামনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে এলেন।

পরদিন থেকে দু'বেলা খিচুড়ি আর আটার রুটি নিয়মমাফিক তৈরি করে সম্রাটের 'শাহিভোজ'-এর আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু এভাবে কয়দিন? তিনি তো কেবল একজন বাবুর্চি নন, তিনি একজন রন্ধনশিল্পী। রান্না করাটা তার কাছে শিল্পের সমতুল্য। প্রতিদিন নানা পদ আর নানা স্বাদ-গন্ধের রান্না করাটা তো কেবল তার পেশা নয়, নেশা হয়ে গেছে। এ শিল্পের নেশা তো তিনি খিচুড়ি ৬রান্না করে আর আটার রুটি সেঁকে উপশম করতে পারবেন না।

যার রান্নার জন্য চাল আসতো মুলতান থেকে, জাফরান-এলাচ-লবঙ্গ আসতো পারস্য থেকে, জয়তুন তেল আসতো কাবুল থেকে, মসলা আসতো সিংহল থেকে, তৈজস আসতো জাহাঙ্গীরনগর থেকে; তিনি

কীভাবে পারবেন খিচুড়ি আর রুটির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে? তারও তো একটা রুচিবোধ আছে!

তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, এ চাকরি তিনি আর করবেন না। যে শিল্প তিনি বছরের পর বছর ধরে আয়ত্ত করেছেন, হেলায় তা হারাতে চান না। হোক তার মুনিব সম্রাট কিংবা আর যে কেউ। অবশেষে তিনি সম্রাটের ব্যক্তিগত বাবুর্চির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন।

পুরনো বাবুর্চি ইস্তফা দিয়ে চলে যাবার পর নতুন সম্রাট আরেকজন বাবুর্চি ঠিক করলেন। তাকেও একই আদেশ দিলেন সম্রাট। এ বাবুর্চিও কিছুটা অবাক হলেন, কিন্তু সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য। অগত্যা দৈনিক খিচুড়ি আর রুটি বানিয়ে সম্রাটকে খাওয়াতে লাগলেন।

কিন্তু বিধিবাম! এ বাবুর্চিও মাস না-যেতেই সম্রাট সমীপে ইস্তফার আবেদন করলেন। কী আর করা, সম্রাট তাকেও বিদেয় করে দিলেন।

সম্রাট বাবুর্চিদের এমন হুটহাট চলে যাওয়াতে খানিকটা বিব্রত বোধ করলেন। নিজের কৃচ্ছ্রতার কথা ভেবে এবার দেখে শুনে নতুন আরেকজন বাবুর্চি রাখলেন। কাজে যোগ দেয়ার আগে তাকে শর্ত দিলেন– আমার বাবুর্চি হিসেবে থাকতে হলে তোমাকে কমপক্ষে এক বছরের চুক্তি করতে হবে। এক বছরের আগে তুমি এখান থেকে চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না। যদি রাজি থাকো তাহলেই কেবল চাকরি করতে পারো। নয়তো এখনই বলে দাও, আমি অন্য লোক খুঁজে নেবো।

নতুন বাবুর্চি ভাবলেন, শাহিমহলে এক বছর কেন, সারা জীবনও যদি তাকে থাকতে হয়, তবুও তিনি অমত করবেন না। তিনি সানন্দে সম্রাটের শর্তে রাজি হয়ে গেলেন।

চাকরিতে যোগ দেয়ার প্রথম দিনই সম্রাট তাকে খিচুড়ি আর রুটি তৈরি করতে বললেন। বাবুর্চি খুশিমনে রসুইঘরে চলে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, আজ হয়তো সম্রাট নিরামিষ খাবেন, এজন্য এই সামান্য খাবার তৈরি করতে বলেছেন। তিনি মনের আনন্দে অল্প সময়ের মধ্যেই খিচুড়ি রান্না করে ফেললেন। মনে তার আনন্দ ধরে না, মোগল শাহিমহলের বাবুর্চি তিনি, সম্রাটের একান্ত বাবুর্চি!

এক দিন গেলো। দ্বিতীয় দিনও সম্রাট একই খাবার তৈরি করতে বললেন। বাবুর্চি একটু অবাক হলেও ভাবলেন, সম্রাটের পরিপাকতন্ত্রে হয়তো কিছুটা গোলযোগ দেখা দিয়েছে, এ কারণে এই অখাদ্য খাচ্ছেন। কাল থেকেই নানা পদের শাহিভোজ রান্না হবে।

দুই দিন গেলো, তিন দিন গেলো, পুরো সপ্তাহ পার হয়ে গেলো। সম্রাটের সেই একই খাবার– সকালে খিচুড়ি আর রাতে আটার রুটির সঙ্গে ডাল বা সবজি। এবার প্রমাদ গুনলেন বাবুর্চি। বুঝতে পারলেন, আগের বাবুর্চিরা কেন হুটহাট করে শাহি বাবুর্চিখানা ছেড়ে চলে গেছেন– সম্রাটের নিত্যদিনের খাবারের তালিকা এ-ই! কিন্তু বুঝেও কোনো লাভ নেই। কেননা তিনি কথা দিয়ে ফেলেছেন– এক বছরের আগে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে যেতে পারবেন না। নিজের বোকামিতে নিজেই ফেঁসে গেছেন।

কিন্তু এভাবে তো থাকা অসম্ভব। দুবেলা খিচুড়ি আর রুটি তৈরি করা– এটা তো একজন প্রথিতযশা বাবুর্চির জন্য মানহানিকর কাজ। যেভাবে হোক এই চাকরি থেকে তাকে পরিত্রাণ পেতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

বাবুর্চি একটা বুদ্ধি আঁটলেন– সম্রাটের খাবার এমন বিস্বাদ করে রান্না করবেন, যাতে সম্রাট নিজেই তাকে চাকরি থেকে বিদেয় করে দেন। এটাই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। যেই ভাবা সেই কাজ।

পরদিন বাবুর্চি খিচুড়ি রান্না করলেন। খিচুড়িতে যে পরিমাণ চাল দিয়েছেন, ঠিক সে পরিমাণ লবণও ঢেলে দিলেন। যাতে খিচুড়ি মুখে দিয়েই সম্রাট বিস্বাদে মুখ কুঁচকে ফেলেন এবং রাগান্বিত হয়ে তাকে শাহিমহল থেকে বের করে দেন।

সম্রাট খেতে বসলেন। তার সামনে খিচুড়ির থালা এগিয়ে দেয়া হলো। সম্রাট প্রথম লোকমা মুখে দিলেন। বাবুর্চি পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ করছেন সম্রাটের অভিব্যক্তি। উঁহু, খিচুড়ির লোকমা মুখে দিয়ে সম্রাটের মুখে কোনো ভাবান্তর ঘটল না। অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিকভাবেই খেতে লাগলেন অখাদ্য লবণাক্ত খিচুড়ি। কোনো কুঁচকানো নয়, কোনো শেকায়েত নেই।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে সম্রাট দরবারে চলে গেলেন, বাবুর্চিকে কিছুই বললেন না। বাবুর্চি হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সম্রাটের যাত্রাপথে। মনে মনে ভাবলেন, দেখা যাক কাল কী হয়!

পরদিন খিচুড়ি রান্না করলেন একদম লবণ ছাড়া পানসে করে। সম্রাটও আগের দিনের মতোই কোনো অভিযোগ-শেকায়েত ছাড়াই তৃপ্তিসহকারে খেয়ে চলে গেলেন। বাবুর্চির প্রতি কোনো ধরনের কোনো বিতৃষ্ণাই প্রকাশ করলেন না। বাবুর্চিও অবাক! এতো ক্ষমতাধর সম্রাট, বিশাল সালতানাতে হিন্দুস্তানের রাজাধিরাজ তিনি, অথচ এমন অখাদ্য খেয়েও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু বাবুর্চিও গোঁ ধরে আছেন, তিনি এর শেষটা দেখে ছাড়বেন।

পরদিন বাবুর্চি খিচুড়ি রান্না করলেন একেবারে ঠিকঠাকমতো, পরিমিত চাল-ডাল, লবণ-মসলা দিয়ে।

সম্রাট খেতে এলেন। তার সামনে নিত্যদিনের খাবার খিচুড়ি পরিবেশন করা হলো। সম্রাট আজও কোনো কথা না বলে একমনে খাওয়া শেষ করলেন। তার চেহারায় কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। বাবুর্চি আবার প্রমাদ গুনলেন।

খাওয়া শেষ করে সম্রাট তাকালেন বাবুর্চির দিকে। শান্তকণ্ঠে বললেন, মিয়াসাব, খিচুড়ি যখন রান্না করবে তখন একেক দিন একেক নিয়মে রাঁধবে না। যদি লবণ বেশি দাও তাহলে প্রতিদিন বেশি দিয়েই রান্না করবে। যদি কম দাও তবে প্রতিদিন কম দিয়েই চালিয়ে দেবে। আর যদি পরিমিত দিতে চাও, তাহলে সেটাও প্রতিদিন এক সমান করে দেবে। এতে তোমারও রান্না করতে ঝামেলা কম হবে, আবার আমারও খাওয়ার সময় রুচির ভিন্নতা হবে না। কথাগুলো কি আমি তোমাকে বোঝাতে পারলাম?

সম্রাটের এমন শান্ত-ধীর কথা শুনে বাবুর্চির চোখজুড়ে পানি চলে এলো। তিনি বিনীত হয়ে বললেন, বাদশাহ নামদার! যদি অভয় দেন তাহলে দুটো কথা বলতে চাই।

সম্রাট তাকে অভয় দিয়ে বললেন, আচ্ছা বলো, কী বলতে চাও।

বাবুর্চি অভয় পেয়ে বলতে শুরু করলেন, বাদশাহ্ সালামত! আমার ঘরে সাতটি মেয়ে, বিরাট সংসার আমার। আপনার এখানে চাকরি হওয়ার পর লোকজন আমাকে শাহি বাবুর্চি হিসেবে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। মনে করে, আমি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক ভালো আছি। অথচ আপনার এখানে চাকরি নেয়ার পর আমাদের না খেয়ে মরতে হচ্ছে। এখানে চাকরির প্রস্তাব পেয়ে ভেবেছিলাম, আপনার পারিবারিক কাজে আমাকে নিয়োগ দেয়া হবে। আশা করেছিলাম, বাদশার এতো কাছে থাকতে পারলে সমাজে অল্পদিনে সম্পদশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবো। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতি দেখছি, তাতে তো আগামী একটি বছর আমাদের না খেয়ে বা আধা পেট খেয়ে থাকতে হবে। মেহেরবানি করে আমাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিলে চিরকৃতজ্ঞ হবো। আমাকে তো আমার সংসারের কথাটাও ভাবতে হবে।

সম্রাট মনোযোগসহকারে তার কথাগুলো শুনে বললেন, আচ্ছা, এই কথা? বলো, তোমার কি ভালো খাবার দরকার, না অর্থের দরকার?

বাবুর্চি দেরি না করে বললেন, অর্থের দরকার, জাহাঁপনা।

সম্রাট তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো। আগামীকাল তুমি যখন আমার জন্য খিচুড়ি রান্না করবে, তখন সেখানে আরো আধা সের চাল বেশি দিয়ে দেবে। বাকিটুকু কাল তোমাকে বলবো।

এ কথা বলে সম্রাট চলে গেলেন। বাবুর্চি সম্রাটের কথার তাৎপর্য কিছুই না বুঝে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরদিন বাবুর্চি যথারীতি আধা সের চাল বেশি দিয়ে খিচুড়ি রান্না করলেন। সম্রাট খাওয়া শেষ করে বাবুর্চিকে ডেকে বললেন, তোমার রসুইঘর থেকে সাতটি সুন্দর পেয়ালা নিয়ে এসো।

বাবুর্চি সাতটি পেয়ালা নিয়ে এলেন। সম্রাট বাকি খিচুড়িটুকু সাতটি পেয়ালায় সমান ভাগে ভাগ করে একটি তশতরিতে সাজিয়ে উপরে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। বাবুর্চিকে বললেন, এই সাতটি পেয়ালা তুমি আমার সাত মন্ত্রীর বাসভবনে নিয়ে যাবে। প্রত্যেক মন্ত্রীকে

একটি করে পেয়ালা দিয়ে বলবে– সম্রাট আপনার জন্য এ তোহফা পাঠিয়েছেন। পেয়ালা গ্রহণ করার পর তারা যদি তোমাকে কিছু দেয়, তবে তা সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

বাবুর্চি সম্রাটের কথামতো পেয়ালাগুলো নিয়ে মন্ত্রীদের বাসভবনের দিকে গেলেন। প্রত্যেক মন্ত্রীর দরজায় গিয়ে 'সম্রাটের তোহফা' বলতেই মন্ত্রীরা তাকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে তাকে আপ্যায়িত করলেন এবং প্রত্যেকেই সম্রাটের তোহফা পেয়ে খুশি হয়ে তাকে এক লাখ রুপি করে এনাম দিয়ে দিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাকে আরো নানা ধরনের উপঢৌকনে ভরিয়ে দিলেন।

একটু পর বাবুর্চি তশতরিতে সাত লাখ রুপি আরো নানা এনাম নিয়ে সম্রাটের সামনে উপস্থিত হন। সম্রাট তাকে দেখে বলে ওঠেন, কী, এবার মেয়েদের নিয়ে ভালোভাবে জীবনযাপনের ব্যবস্থা হয়েছে তো?

বাবুর্চি কান্নাজড়িত গলায় বললেন, আপনার একান্ত মর্জিতে আজ যা কিছু অর্জন হলো, বাকি জীবন এ দিয়ে সচ্ছলতার সাথে জীবনযাপন করতে পারবো। তবে জাহাঁপনা, না বুঝে আপনাকে আমি যে কষ্ট দিয়েছি, আমার এ গোস্তাখি মাফ করবেন।

সম্রাট স্মিত হেসে বললেন, অবশ্যই মাফ করবো, যদি তুমি এখন থেকে খাবারে পরিমিত লবণ ব্যবহার করো!

পাঠকদের কি জানতে ইচ্ছে হচ্ছে– কে এই সম্রাট? তিনি হচ্ছেন মোগল সালাতানাতের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ঈমানদার সম্রাট– আওরঙ্গজেব, বাদশাহ আলমগীর। টুপি সেলাই করে আর কোরআন লিখে যিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ কারণেই ইতিহাস তাকে আদর করে ডাকে– 'ফকির বাদশাহ' নামে।

মঙ্গোল-কাহিনি

দুর্ধর্ষ মঙ্গোল বীর চেঙ্গিস খান তখন পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য জয় করে কেবল মঙ্গোলিয়ায় থিতু হয়েছেন। এবার তিনি চোখ ফেরালেন মধ্য এশিয়ার দিকে। তার ইচ্ছা– তিনি মধ্য এশিয়ার আরো কিছু রাজ্য জয় করে গড়ে তুলবেন তার মঙ্গোল সাম্রাজ্য। এ কারণে তিনি এই অঞ্চলের বাদশাহ ও গভর্নরদের কাছে দূত প্রেরণ শুরু করেন।

মধ্য এশিয়ার খারেজমে নিযুক্ত খলিফা আলাউদ্দিনের গভর্নরের কাছেও চেঙ্গিস খান তার দূত পাঠালেন। কিন্তু খলিফার নিযুক্ত সেই গভর্নর আত্মম্ভরিতার দরুন চেঙ্গিস খানের সেই দূতকে বিধিবদ্ধ সম্মান তো দেখালেনই না বরং তার সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করলেন। দূত গভর্নরের দরবারে এলে তার সমস্ত মাল-সামানা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বন্দী করে রাখা হলো এবং তাকে নানাভাবে নির্যাতন করা হলো।

চেঙ্গিস খান যখন এ সংবাদ জ্ঞাত হলেন, তখন তিনি খলিফা আলাউদ্দিনের নিকট একজন দূত পাঠিয়ে তার গভর্নরের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়ে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন।

কিন্তু এই মূর্খ খলিফা ছিলেন আরো একধাপ বেতমিজ। খলিফা চেঙ্গিস খানের পক্ষ থেকে আগত প্রতিনিধিদলকে বন্দী করে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে ফেললেন। শুধু একজনকে বাঁচিয়ে রেখে তার দাড়ি, গোঁফ ও ভ্রূর অর্ধেক কামিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

চেঙ্গিস খান তখন রাশিয়ার একটি অঞ্চলে শিকারে ব্যস্ত ছিলেন। প্রতিনিধিদলের একমাত্র জীবিত লোকটি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে

সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলো। চেঙ্গিস খান সবকিছু শুনে রাগে-ক্ষোভে এক টিলার ওপর আরোহণ করে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'হে মুসলমানদের খোদা! আমার ওপর জুলুম করা হয়েছে। সেই জালেমের বিপক্ষে তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

এরপর চেঙ্গিস খান ইরান আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলেন। যখন তার বাহিনী মুসলিম সৈন্যদের মুখোমুখি হলো, এক আল্লাহওয়ালা লোক তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে এলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, আল্লাহর ফেরেশতারা তাতারিবাহিনীর পেছনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'ওহে কাফেরবাহিনী! ওই জালেমদের ওপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা করে ফেলো।'

ফলে সেদিন চেঙ্গিস খান এক মৃত্যুদূত হয়ে বিশ লক্ষাধিক লোক-অধ্যুষিত শহর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন এবং আগুন জ্বালিয়ে সব পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন।

আফগানিস্তানের বামিয়ান নগরের এক লড়াইয়ে চেঙ্গিস খানের পৌত্র নিহত হয়। এ ঘটনায় চেঙ্গিস খান এতোটা রোষায়িত হন, সে নগর বিজয়ের পর এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হলো, নগরের একটি কুকুর-বিড়ালও যেন জীবিত না থাকে। সব হত্যা করা হোক। ফলে সেই হত্যাযজ্ঞ থেকে কোনো মানবসন্তানের পক্ষেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব হলো না। অথচ ইতোপূর্বে বিজিত সমস্ত নগরে যুবক-যুবতীদের দাস-দাসী বানিয়ে শুধু বৃদ্ধ ও বয়স্কদেরকেই হত্যা করা হতো। আর ধন-সম্পদ সব লুট করে নেওয়া হতো। কিন্তু বামিয়ান নগরে এমনভাবে রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া হলো, সেই বিভীষিকাময় হত্যাযজ্ঞ অবলোকন করার জন্য সেখানে একটি প্রাণীও জীবিত রইলো না।

চেঙ্গিস খানের সর্বশেষ যুদ্ধ হয়েছিলো সিন্ধু নদের তীরে খারেজমের শাহজাদা জালালুদ্দিনের সঙ্গে। সে যুদ্ধেও মুসলমানদের চরম পরাজয় ঘটে। ফলে তাতারিদের সম্পর্কে মুসলমানদের মনে এমন একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে– তাতারিরা কখনো পরাজিত হতে পারে না।

মোট কথা, মুসলমানগণ তাতারি দূতদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের মুসলমানদের ওপর এমন প্রবল-

প্রচণ্ড করে দিলেন, তারা মুসলমানদের সালতানাতকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে পুরো মুসলিম সালতানাতকেই ধূলিসাৎ করে ফেলেছিলো। মঙ্গোল তাতারিরা ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম দেশগুলোতে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলো, তার ক্ষতি আদৌ পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ইসলামের রোশনিতে তাতারিরা

দম্ভের সাজা ভোগ করতে করতে মুসলমানদের অস্তিত্বের পিঠ যখন একেবারে দেয়ালে গিয়ে ঠেকলো, আল্লাহ্ তাআলা তখন দাওয়াত ও তাবলিগি শক্তির প্রকাশ ঘটালেন।

চেঙ্গিস খান ততোদিনে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পুত্ররা ক্ষমতায়। রাশিয়ার রাজত্ব চেঙ্গিস-দৌহিত্র জুজির হাতে। গোবি মরুতে অবস্থিত কারাকোরামের শাসনভার আফদায়িনের হাতে। তৃতীয় পুত্র চুগতাইকে দেওয়া হয়েছিলো তুর্কিস্তানের রাজ্যভার। আর চতুর্থ পুত্র তলওয়ায়িকে দেওয়া হয়েছিলো ইরাক-ইরান-আফগানিস্তানসহ অত্র অঞ্চলের শাসনভার।

চেঙ্গিস খানের অনেক পরের কথা। তখন চলছিলো তার পৌত্র হালাকু খানের যুগ। একমাত্র মিসর ছাড়া গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য তখন তাদের পদানত। হালাকু খান মিসর বিজয়ের মানসে যুদ্ধযাত্রার মনস্থ করলেন। এ সংবাদে মুসলমানরা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে প্রতিরোধ বা প্রতি-আক্রমণের কোনো মনোবলই রইলো না।

মুসলমানদের এই ক্রান্তিকালে আল্লাহ্ তাআলার ভিন্ন এক নিদর্শন কার্যকর হলো। মিসরের তৎকালীন বাদশাহ রুকনুদ্দিন কিছুসংখ্যক আলেম-ওলামাকে ব্যবসায়ীর সাজে তাতারিদের এলাকায় দাওয়াত ও তাবলিগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো– অস্ত্রবলে তাতারিদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করা মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তাই দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে তাদের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়ে যদি কোনোভাবে মুসলমানদের চূড়ান্ত পতন রোধ করা যায়!

চেঙ্গিস খানের বড় পুত্র জুজির পৌত্র দরকা (বেরকি) খান ছিলেন তৎকালীন রাশিয়ার অধিপতি। রাশিয়ায় তুর্কি মুসলিম ব্যবসায়ীগণ পণ্য বিক্রির পাশাপাশি দীনের দাওয়াতের কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন অক্লান্ত ভাবে। ফলে তাতারিরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। সৌভাগ্যক্রমে নও-মুসলিমদের সে দলে দরকা খানের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীও ছিলেন। তিনি কৌশলে রাজার কাছে ইসলামের সৌন্দর্য পেশ করতে লাগলেন। একদিন দরকা খান জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কাছে এসব কথা কারা বলে যায়?'

মন্ত্রী বললেন, 'তুর্কিস্তানের সেই মুসলিম বণিকরা আমাদের এসব কথা শুনিয়েছেন।'

দরকা খান বললো, 'তারা আবার এলে আমাকে জানাবে।'

একসময় মুসলিম ব্যবসায়ীরা পুনরায় রাশিয়ায় আগমন করলে তাদের রাজদরবারে উপস্থিত করা হলো। রাজা ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মুসলমানগণ তাকে কোরআনের মহাসত্যের কথা শোনালেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়েত দান করলেন। ফলে তিনি ইসলামের সৌভাগ্য-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হলেন। রাজার ইসলাম গ্রহণ করার ফলে তার প্রায় গোটা রাজ্যের অধিবাসীরাই ইসলাম গ্রহণ করে নিলো।

ওদিকে হালাকু খান মিসর আক্রমণ করার সংকল্প করে সৈন্যসহ বেরিয়ে পড়েছেন। তিনি মিসর অধিপতি রুকনুদ্দিনের নিকট এই মর্মে পয়গাম পাঠালেন– 'দেয়াল ভেঙে দাও, দরজা খুলে দাও। একই জমিনের ওপর দুই ব্যক্তির শাসন চলতে পারে না। আমার কথা মেনে নিলে তোমাদের প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হবে। অন্যথায় নীলনদ তোমাদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে।'

হালাকু খান তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। রুকনুদ্দিন সে কথা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে দরকা খানের নিকট পত্র লিখলেন। দরকা খান সে বিষয়ে অবগত হয়ে অনতিবিলম্বে হালাকু খানের নিকট এই মর্মে পয়গাম প্রেরণ করলেন– 'মিসর আক্রমণের পূর্বে তোমাকে আমার মোকাবেলা করতে হবে।'

এই বার্তা পেয়ে হালাকু খান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মোকাবেলা কেন? তোমার কি চেঙ্গিস খানের সেই নীতি জানা নেই– তাতারিরা পরস্পর কখনো লড়াই করবে না?'

জবাবে দরকা খান বললেন, 'তুমি একজন কাফের, আর সে-ও ছিলো একজন কাফের। কিন্তু আমি একজন মুসলমান। আজ তোমার আর আমার মাঝে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। এখন মিসর আক্রমণ করতে চাইলে তোমাকে প্রথমে আমার মোকাবেলা করতে হবে।'

দরকা খানের এ পয়গাম পেয়েও হালাকু খান যখন তার সঙ্কল্পে অটল রইলেন, তখন দরকা খানও তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং পঞ্চাশ বছরের তাতারি ইতিহাসে এই প্রথম দুই তাতারির তলোয়ার পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝনঝনিয়ে উঠলো। আর ইতিহাস বদলের এই বৈপ্লবিক ঘটনার পেছনে ভূমিকা ছিলো কিছুসংখ্যক মুবাল্লিগে দীনের।

এক মহান বিপ্লবের সূচনা

তাতারি জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন এবং এক ঐতিহাসিক বিপ্লব সূচিত হলো। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, রাজ্য নেই, রাজত্ব নেই; শূন্য হাতে এই বিপ্লব কীভাবে সম্ভব হলো? আসলে বিপ্লব ঘটে মানুষের হৃদয়ে। মানুষের মনোভাবের পরিবর্তনই মূলত তার মধ্যে বিপ্লব ঘটায়। দাওয়াতের সেই নবিওয়ালা আমলই তাতারিদের কঠিন হৃদয়ের কপাট ভেঙে তাতে এক মহাবিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলো।

মানুষের হৃদয়জগতে যখন বিপ্লব ঘটে, সেখানে পরিবর্তন সূচিত হয়, তখন মানুষের মন আল্লাহমুখী হয়ে ওঠে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার জীবনধারায় পরিবর্তন আসতে থাকে। মানুষের মাঝে যখন দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ চলতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা মানুষের মনের জমিনকে কোমল করে দেন। সেখানে বিপ্লবের বীজ রোপিত হয় এবং

তার মন ও মননে ক্রমশ আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর এভাবেই কোনো বাহ্যিক শক্তির সমর্থন ছাড়া আল্লাহ্ তাআলা এক তাতারিকে আরেক তাতারির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য করেছিলেন।

মঙ্গোলবীর তৈমুরের ইসলাম গ্রহণ

তৈমুর তুঘলক ছিলেন হালাকু খানের তৃতীয় অধস্তন পুরুষ। তদানীন্তন বুজুর্গ জালালুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলায়হি একবার তাকে দীনের দাওয়াত দিলেন। জবাবে তিনি বললেন, 'এখনো আমি একজন গভর্নর মাত্র। যেদিন গোটা রাজ্যভার আমার হাতে আসবে সেদিন আসবেন, আমি ভেবে দেখবো।'

কিন্তু জালালুদ্দিন [রহমাতুল্লাহি আলায়হি]-এর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি বাদশাহ্ হতে না পারায় বুজুর্গ জালালুদ্দিন স্বীয় পুত্র রশিদুদ্দিনকে ওসিয়ত করে যান– 'প্রিয় পুত্র! আমি তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। তৈমুর তুঘলক যখন বাদশাহ্ হবে, তখন তুমি আমার পয়গাম তার নিকট পৌঁছে দিও।'

তৈমুর বাদশাহ্ হওয়ার পর রশিদুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলায়হি তার রাজধানী মঙ্গোলিয়ার উদ্দেশে রওনা হলেন। কিন্তু সেই রাজমহলে পৌঁছার কোনো উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না। প্রহরীরা তার মতো অপরিচিত কাউকে প্রাসাদে ঢোকার অনুমতি দিলো না।

কোনো উপায় না পেয়ে এক রাতে তিনি প্রাসাদের কাছে দাঁড়িয়ে খুব জোরে ফজরের আজান দিলেন। আজান শুনে রাজার ঘুম ভেঙে গেলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কেমন সঙ্গীত? এমন জোরে কে চিৎকার করছে? তাকে ধরে নিয়ে আসো।'

এরপর তাকে রাজদরবারে উপস্থিত করা হলো। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'দরবেশ! আপনার পরিচয় কী?'

তিনি বললেন, 'আমি জালালুদ্দিনের পুত্র রশিদুদ্দিন।'

তৈমুর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কী?'

রশিদুদ্দিন বললেন, “আপনি আমার পিতাকে বলেছিলেন, ‘যখন আমি বাদশাহ হবো, তখন এসো।’ আমি তার সেই দায়িত্ব পালন করতে এসেছি।”

তৈমুর তুঘলক বললেন, ‘হ্যাঁ, এবার ইসলাম সম্পর্কে আমাকে বলো।’

তিনি দাওয়াত দিলেন। ফলে তৈমুর ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি তার এক উজিরকে ডাকলেন। তাকে বললেন, ‘আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি, তুমি কী বলো?’

উজির ছিলেন চারজন। তাদের একজন মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। বাকি তিনজনকে ডেকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলো। ফলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। তারপর ডাকলেন সেনাপতিকে। তাকে বললেন, ‘আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি, তোমার কী অভিমত?’

সেনাপতি বললেন, ‘মুখের ভাষার চেয়ে তলোয়ারের ভাষাই আমার কাছে অধিক বোধগম্য। অস্ত্রের ভাষাই আমি বেশি বুঝি। আপনাকে যে ব্যক্তি ইসলামের দাওয়াত দিতে এসেছে, তাকে আমার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। সে যদি আমাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়, তবেই কেবল আমি ইসলাম গ্রহণ করবো, অন্যথায় নয়।’

তৈমুর বললেন, ‘এটা কীভাবে হতে পারে। যে বিষয়কে জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়, তা তুমি অস্ত্র দিয়ে বুঝতে চাইছো?’

সেনাপতি বললেন, ‘আপনি যা-ই বলুন, কোনো কিছু উপলব্ধি করার জন্য আমার কাছে এই অস্ত্র ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই।’

রশিদুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলায়হি তখন বললেন, ‘ঠিক আছে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো।’

তাকে বলা হলো, ‘এটা ঠিক হবে না। কারণ, এই সেনাপতি তার গোটা জীবন যুদ্ধ আর অস্ত্র নিয়ে কাটিয়েছে। তার সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া আত্মহত্যারই নামান্তর। সবকিছু জেনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা অবশ্য আপনারই।’

তিনি বললেন, 'আমি লড়াই করবো।'

***

পরদিন লড়াই হবে বলে শহরে ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হলো। রশিদুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলায়হি রাতে আল্লাহ তায়ালার নিকট হাত তুলে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনার দীনের দাওয়াত দিতে এসেছি। এখন যদি আমাকে মারতে হয়, মেরে ফেলুন। আর যদি দীনের কাজ করাতে হয় তো আপনিই সে ব্যবস্থা করুন।'

পরদিন নির্দিষ্ট স্থানে গোটা নগর ভেঙে পড়লো। সেনাপতি দুটি লৌহবর্ম পরিধান করে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। তার দুই হাতে দুটি তরবারি।

ওদিকে তার প্রতিপক্ষ রশিদুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলায়হির হাতে একটি ক্ষুদ্র খঞ্জরও নেই। একেবারে শূন্য হাতে ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন সেনাপতি তাকে নিজের একটি তরবারি দিয়ে বললেন, 'এই নাও অস্ত্র।'

রশিদুদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলায়হি বাঁ হাতে সেই তরবারি তুলে নিয়ে ডান হাতে সেনাপতির বুকে এমন এক ঘুষি মারলেন, তিনি দূরে ছিটকে পড়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

জ্ঞান ফিরে আসার পর সেনাপতি বলতে লাগলেন, এক ঘুষিতেই আমি ইসলাম বুঝে গিয়েছি। লড়াইয়ের আর প্রয়োজন নেই।

এরপর বাদশাহ তৈমুরের হাতে সে দেশের দশ লাখ লোক ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মঙ্গোলিয়ায় বাদশাহ তৈমুরের সমাধি এখনো বিদ্যমান আছে। সে সমাধির গায়ে লেখা আছে– 'তাতার অধিপতির সমাধি, যার হাতে দশ লক্ষ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।'

দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতকারী মুষ্টিমেয় কিছু লোক সেদিন উম্মতের ওপর বিশাল ইহসান করে গিয়েছেন। তাতারিরা যদি তখন

ইসলাম গ্রহণ না করতো, তাহলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অগ্রযাত্রা রুখার মতো কোনো শক্তি ছিলো না। সে জাতি এমনই শক্তিশালী ছিলো, ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত না খেয়ে তারা ঘোড়ার পিঠে ছুটে বেড়াতে পারতো। খুব পিপাসাকাতর হয়ে পড়লে ঘোড়ার পিঠে খঞ্জর মেরে নির্গত রক্তের ধারা পান করে নিতো। এই ছিলো তাদের পানীয়।

এমন একটি জাতির মোকাবেলা বাহুবলে করা খুব কঠিন বৈকি। সেই দুর্জয় জাতিকে দাওয়াত ও তাবলিগের বরকতে আল্লাহতায়ালা মুসলমান বানিয়ে দিলেন। রাশিয়ার সে অঞ্চলের অধিবাসীরা এখনো পর্যন্ত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রিত আছে।

তওবার রহমতে স্নাত

লোকটির অপরাধ ছিলো মারাত্মক। এমন অপরাধের শাস্তি যে কতো গুরুতর, সে ব্যাপারে তার আগেই ভাব উচিত ছিলো। আগেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে তার প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন ছিলো। তাহলে হয়তো গুরু শাস্তি আর তার ওপর পতিত হতো না।

কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে–মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে তার নামে। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল ঘোষণা করেছেন তার মৃত্যুদণ্ড– 'মক্কার যেখানেই তাকে পাওয়া যাবে, গর্দান উড়িয়ে দেবে।'

তার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ। কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎই তাকে কী ভীমরতিতে ধরলো কে জানে, ঘোষণা দিয়ে তিনি আবার পূর্বের ধর্মে গেলেন। সোজা কথায় মুরতাদ হয়ে গেলেন। শুধু তা-ই নয়, মুরতাদ হয়ে তিনি ইসলাম, আল্লাহ-রাসুল, কোরআন-কিতাব নিয়ে যাচ্ছেতাইভাবে মানুষের মাঝে বিষোদ্গার শুরু করে দিলেন।

এ সংবাদ তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌঁছালো, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহর এমন অভব্য আচরণের কথা জানতে পেরে তিনি ঘোষণা দিলেন তার মৃত্যু পরোয়ানার।

আল্লাহর রাসুল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যসমেত মক্কায় এলেন। বিনাযুদ্ধে জয় করে নিলেন মক্কা। বিজয়ী বীরবেশে প্রবেশ করলেন কাবা চত্বরে। দশ বছর পর।

মক্কায় প্রবেশ করে মক্কার সকল অধিবাসীকে ক্ষমা করে দিলেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হলো। তাঁর প্রাণের শত্রু ছিলেন যারা একসময়, যারা তাকে অকথ্য নির্যাতনে রক্তাক্ত করেছিলো, তাদেরও নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিলেন। তিনি তো মানবতার নবি, তিনি তো ইনসাফের নবি!

তবে কয়েকজন ব্যক্তিকে রাখা হলো ক্ষমার বাইরে, এদের জন্য ক্ষমা নেই। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রচিন্তা, ইসলামের প্রভূত মঙ্গলকামনা, মানবতার আশু শুদ্ধতার জন্যই এ গুটিকয়েক অপরাধী লোকের ব্যাপারে পরোয়ানা জারি হলো– যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে, সেখানেই তাদের হত্যা করতে হবে। তাদেরই একজন আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ্।

আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ্ রাসুলের মক্কা বিজয়ের সংবাদ শুনেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আবার নিজের মৃত্যু পরোয়ানার সংবাদ শুনে ভয়ে তটস্থ হয়ে গেলেন। নিজের ভুলের জন্য এখন নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। দুষ্ট লোকদের বুদ্ধিতে কেন যে তিনি ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন! কিন্তু এ পরোয়ানার হাত থেকে বাঁচতে কী করা যায় এখন?

আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহর দুধভাই ছিলেন রাসুলের জামাতা এবং অত্যন্ত প্রিয়ভাজন জিন্নুরাইন হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। অত্যন্ত ভদ্র এবং সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে তার আলাদা কদর আছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ এসে ধরলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে– 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমার বায়আতের ব্যবস্থা করে দাও। আমি তওবা করছি।'

উসমান রাদিয়াল্লাহু তার আবেদন শুনে প্রথমেই তাকে দূরে সরিয়ে দিলেন– তার পক্ষে রাসুলের আদেশের বিপরীতে কোনো আবেদন করা সম্ভব নয়। কিন্তু আবদুল্লাহ নাছোড়বান্দা, তিনি যে কোনোভাবেই হোক আজ তওবার আশ্রয় নিয়েই ছাড়বেন। অগত্যা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গেলেন।

রাসুলসমীপে এসে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে তওবার আবেদন করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি আবার বিনীত হয়ে নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে তওবার আবেদন জানালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার তিনি নিজের পাপের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে তওবার জন্য মিনতি করলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। একটু পর মাথা উঁচু করে মুচকি হেসে তার তওবা কবুল করে নিলেন এবং তার বিরুদ্ধে জারি করা মৃত্যু পরোয়ানাও তুলে নিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে বয়ে গেলো প্রশান্তির ফল্গুধারা। মন থেকে মুছে গেলো এতোদিনের জমে থাকা সমস্ত পাপের ক্লেদ। মনে হচ্ছে আজই তিনি পৃথিবীতে নবজন্ম লাভ করেছেন। আজই তিনি প্রথমবার কালেমায়ে শাহাদাতের সুরেলা আওয়াজে অভিভূত হচ্ছেন।

আনন্দে জল ছলছল চোখে রাসুলের হাতে চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেলেন নতুন এক আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ।

আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ চলে যাওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে বললেন– 'এর গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার মতো কি তোমাদের মাঝে কেউ ছিলো না?'

উপস্থিত সাহাবিরা রাসুলের কথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি যদি চোখের ইঙ্গিতে আমাদের এ কথা বলতেন, তাহলেই হয়ে যেতো।'

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিবৃত্ত করে বললেন– 'আল্লাহর রাসুলের জন্য শোভনীয় নয়, তিনি চোখের খেয়ানত করবেন।'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ তার তওবার প্রতিফলস্বরূপ এর প্রতিদান দিয়েছিলেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। তার আন্তরিক তওবার কারণেই আল্লাহ তাকে পার্থিব বিভূতিতেও সম্মানিত করেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে যখন আফ্রিকা বিজয়ের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয়, তখন সে সেনাদলের সেনাপতি করা হয় আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহকে। তিনি খলিফার এ সম্মান প্রদানের প্রতিদান দিয়েছিলেন হরফে হরফে। তিনিই প্রথম কোনো সাহাবি হিসেবে আফ্রিকায় পদার্পণ করেন এবং জয় করে নেন আফ্রিকার বৃহদাঞ্চল। তার এ বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য খেলাফত থেকে তাকে মিসরের প্রথম মুসলিম গভর্নর পদে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এ সাহাবির ইন্তেকালের ঘটনাটি ছিলো অত্যন্ত চমকপ্রদ। মসজিদে ফজর নামাজ পড়াচ্ছিলেন। ডান দিকে সালাম ফেরালেন। তারপর বাম দিকে সালাম ফেরাতে ফেরাতে তিনি মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হলেন এবং সে অবস্থায়ই তিনি মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌঁছে গেলেন।

আহ! খোশ কিসমত!

যেমন কুকুর তেমন মুগুর

চোর চুরি করতে এসে বুঝে ফেললো, বাড়ির মালিক তাকে চিনে ফেলেছেন। এখন কী করা যায়? অবস্থা দুদিক থেকেই বেগতিক। এখন যদি বাড়ির লোকটিকে হত্যা করে তবে দু'দিনের মধ্যেই খলিফার গোয়েন্দারা তাকে ঠিকই ধরে ফেলবে। আবার যদি কিছুই না বলে পালিয়ে যায়, তবে লোকটি সকাল হলেই শহরের কোতোয়ালের কাছে সব বলে দেবে। শেষমেশ চোর একটা উপায় বের করলো।

বাড়ির লোকটির গলায় ছুরি ধরে বললো, 'যদি এ চুরির ব্যাপারে আমার নাম কাউকে বলে দিস তাহলে তোর বউ তালাক– এ কথাটা মুখে উচ্চারণ করে বল। নয়তো তোর গলা এখনই দুই ফাঁক করে ফেলবো।'

সাধারণ একজন ব্যবসায়ী হিসেবে লোকটির আর করার কিছু ছিলো না। নিজের প্রাণের ভয়ে তিনি বলে দিলেন– 'চুরির ব্যাপারে যদি তোমার নাম কাউকে বলে দিই, তবে আমার বউ তিন তালাক।'

চোর এবার খুশিমনে নিশ্চিন্তে যা যা দরকার চুরি করে চম্পট দিলো। যাওয়ার আগে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলো ব্যবসায়ীর করা স্বীকারোক্তির কথা– তার নাম বলে দিলেই কিন্তু প্রিয়তম স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে একদম!

পরদিন সকাল হতেই লোকটির পাগল হওয়ার দশা! একদিকে চুরি যাওয়া সম্পদের শোক, অন্যদিকে স্ত্রী তালাক হওয়ার ভয়। আরো দুঃখের বিষয় হলো, সেই চোরটি তাদের মহল্লারই। সে হেসে হেসে তার সামনে দিয়ে তাকে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছে, অথচ তার নামটি তিনি কাউকে বলতে পারছেন না। রাগে-দুঃখে নিজের হাত নিজে কামড়ানোর মতো অবস্থা।

এ মহল্লায় বাস করতেন ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি। ব্যবসায়ীর বাড়ির চুরির সংবাদটি তিনিও শুনেছেন। ব্যবসায়ীর জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করা ছাড়া আর কীই-বা করার আছে।

একটু পর দেখলেন, ওই ব্যবসায়ী তার দরজায় কড়া নাড়ছেন। তিনি তাকে হাতে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন। ব্যবসায়ী লোকটি ঘরে এসেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ইমাম সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে পাশে বসালেন। বোঝাতে চেষ্টা করলেন– ধন-সম্পদ সবই ক্ষণস্থায়ী জিনিস। একবার যাবে তো আরেকবার আসবে...।

লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হুজুর, ধন-সম্পদ গেছে তাতে যা দুঃখ তার চেয়েও বেশি দুঃখ হলো, চোর সকালবেলা আমার সামনে দিয়ে হেসে হেসে আমাকে সমবেদনা জানিয়ে গেছে, কিন্তু আমি তাকে কিছুই বলতে পারিনি।'

'মানে? তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'জি হুজুর, চোর আমাদের এ মহল্লারই। আমি তাকে চিনি কিন্তু একটা কারণে তার নাম বলতে পারছি না।'

'কী কারণে?'

'খুবই স্পর্শকাতর কারণ, বললেই আমার বউ তালাক হয়ে যাবে।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। দয়া করে পুরো বিষয়টা আমাকে খুলে বলো।'

লোকটি এবার খুব সতর্কতার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন, যাতে তার কথার দ্বারা আবার বউ না তালাক হয়ে যায়। আস্তে ধীরে পুরো বিষয়টি খুলে বললেন।

পুরো ঘটনা শুনে ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) হেসে ফেললেন। লোকটিকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'তুমি অযথা চিন্তা কোরো না, এর সুষ্ঠু সমাধান আছে। তোমার বউও তালাক হবে না, আবার চোরও ঠিকই ধরা পড়বে। তোমাকে কিছুই করতে হবে না, শুধু আগামী জুমার দিন মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর আমি যা বলে দেবো, আমার কথামতো তা-ই করবে। ব্যস, চোর ধরা না পড়ে যাবে কোথায়!'

***

পরের জুমার দিন এলাকার সকল মুসলমান মসজিদে গেলো জুমার নামাজ পড়তে। নামাজের শেষে সবার প্রথম মসজিদ থেকে বের হয়ে এলেন সেই ব্যবসায়ী লোকটি। বের হয়ে মসজিদের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইমাম আজম নামাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের অন্যান্য দরজা ও জানালা বন্ধ করে দিতে বললেন, যাতে কেউ সদর দরজা ছাড়া অন্য দরজা দিয়ে বের হতে না পারে।

মসজিদ থেকে মুসল্লিরা সারিবদ্ধভাবে প্রধান ফটক দিয়ে বের হচ্ছে। বাইরে দাঁড়ানো ব্যবসায়ীটি এক একজনের চেহারা দেখছেন আর পাশে দাঁড়ানো ইমাম আজমকে বলছেন– 'এ লোকটি কি চুরি করেছে?'

ব্যবসায়ী লোকটি বলছেন, 'না, এ লোক চুরি করেনি।'

এভাবে দেখতে দেখতে এবং চোর শনাক্ত করতে করতে যখন সেই চোরটি সামনে এসে দাঁড়ালো, তখনো যথারীতি ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন– 'এ লোকটি কি চুরি করেছে?'

এবার ব্যবসায়ী কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। ব্যস, তাকে চুপ করে থাকতে দেখেই মসজিদের ফটকের পাশে ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে থাকা খলিফার গোয়েন্দারা খপ করে চোরকে ধরে ফেললো। ধরে তাকে সোজা নিয়ে গেলো চৌদ্দ শিকের গরাদে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাই পাই করে ব্যবসায়ীর সম্পদ আবার তাকে ফিরিয়ে দেয়া হলো।

ইমাম আজম (রহ.) ব্যবসায়ী লোকটিকে আগেই বলে দিয়েছিলেন- তোমার সামনে যখন একজন একজন করে মুসল্লিরা বেরোবে তখন সবাইকে দেখে আমি প্রশ্ন করবো যে সে চোর কি না। যে চোর নয় তার ব্যাপারে বলে দেবে- না, সে চোর নয়। কিন্তু যখনই তোমার সামনে চোরটি আসবে, তখন তুমি কিছুই বলবে না, বরং চুপ করে থাকবে। যাতে আমরা বুঝতে পারি সে-ই আসল চোর। এভাবে চোরের নাম না বলার কারণে তোমার বউও তালাক হবে না, আবার চোরও ধরা পড়ে যাবে।

অবশেষে তিনি তা বাস্তবায়িত করেই দেখালেন। একেই বলে- যেমন কুকুর তেমন মুগুর!

শিয়ারা জুতাচোর

একবারের ঘটনা।

ভারতের শিয়া মতাবলম্বীরা বড় বাড় বেড়েছিলো সেবার। তারা দাবি করছিলো– তারা নাকি মুসলমান! শুধু তা-ই নয়, তাদের দাবি অনুযায়ী তারাই নাকি সত্যপন্থী মুসলমান। অন্যরা ভুল পথে রয়েছে।

এমন দাবি শুনে স্বভাবতই ক্ষেপে গেলো সাধারণ মুসলমানরা। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো সেকালের অন্যতম পণ্ডিত আলেম মাওলানা কাসেম নানুতাভি (রহ.)-এর কাছে। তার কাছে গিয়ে খুলে বললো নিজেদের মনের ক্ষোভ-রোষ।

সব শুনে মাওলানা নানুতাভি (রহ.) বললেন, আবেগের বশে কিছু করা যাবে না। যা করার সব চিন্তাভাবনা করে করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় শিয়ারা যদি কোনো উন্মুক্ত মঞ্চে বিতর্কের (বাহাস) জন্য আসে। তাহলে দেখা যেতো, তাদের সত্যপন্থার শক্তি কতোটুকু। তোমরা গিয়ে তাদের বলো– আমরা তোমাদের সঙ্গে সবার সামনে উন্মুক্ত বিতর্কমঞ্চে লড়তে চাই।

নানুতাভি (রহ.)-এর কথামতো জনতা চলে গেলো শিয়াদের কাছে। তারা মাওলানার প্রস্তাব শুনে বাহাসে রাজি হয়ে গেলো। সুতরাং দিন-তারিখ ঠিক করে বাহাসের স্থান নির্ধারণ করা হলো।

নির্ধারিত দিনে বাহাসের ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। এলাকার মানুষজন তো বটেই, দূর-দূরান্ত থেকেও মুসলমান ও শিয়ারা

এসেছে বাহাস দেখতে। এলাকার অনেক হিন্দু জনগণও এসেছে কৌতূহল মেটাতে না পেরে।

নির্দিষ্ট সময় সমাগত। শিয়াদের পক্ষ থেকে তাদের বড় বড় কয়েকজন পণ্ডিতকে ডেকে আনা হয়েছে। তারা ইতোমধ্যেই মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন। মঞ্চের এক পাশে শিয়া ধর্মের বড় বড় কিতাব-পুস্তক স্তূপ করে রাখা হয়েছে– কোনো দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন হলেই যেন এখান থেকে দেখে নেয়া যায়।

কিন্তু মুসলমানদের আলেম মাওলানা কাসেম নানুতাভি কই? তিনি এখনো আসছেন না কেন? উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যেও শোরগোল পড়ে গেলো– মাওলানা সাব কই? এতো দেরি হচ্ছে কেন তার?

নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে শিয়ারা এখনই নানা কথা বলা শুরু করেছে– মুসলমান আলেম আমাদের ভয়ে পালিয়েছেন। বাহাসে পারবেন না জেনে ময়দানেই উপস্থিত হননি। হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছেন।

শিয়ারা অপেক্ষা করতে লাগলো। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে তবু মাওলানা কাসেম নানুতাভির দেখা নেই। মুসলমানদের নাক কাটা যাবার মতো অবস্থা। শিয়াদের উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য এসে নিজেরাই না জানি আজ কী শিক্ষা পেয়ে যান।

শিয়া আলেমরা অধৈর্য হয়ে উঠলেন– নাহ, আর তো অপেক্ষা করা যায় না। নির্দিষ্ট সময় প্রায় শেষ, এখনো যদি মুসলিম আলেম না আসে, তবে শিয়ারাই নিজেদের বিজয়ী ঘোষণা করে বাহাসের ইতি টানবে।

সবাইকে বলে দেয়া হলো। এমন সময় দেখা গেলো, একজন লোক জনতার পেছন থেকে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন। পরনে নীল লুঙ্গি, গায়ে মার্কিন কাপড়ের কোর্তা, মাথায় সফেদ টুপি। দ্বিধাহীন অন্তর। চেহারায় সত্যের দীপ্তি। ভীতিহীন চাহনি।

তিনি নীরবে মঞ্চে উঠলেন। মঞ্চে উঠে সবাইকে সালাম দিয়ে পায়ের জুতোজোড়া খুলে বগলে চেপে রাখলেন। সবাই চিনলো– ইনি মাওলানা কাসেম নানুতাভি।

সবার দৃষ্টি মাওলানা কাসেমের প্রতি। মঞ্চের শিয়া পণ্ডিতরাও ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন মাওলানার দিকে। কিন্তু একটা বিষয় দেখে মুসলমান-শিয়া উভয় দলই দারুণ বিব্রত হয়ে গেলো– মাওলানা কাসেম নানুতাভি পায়ের জুতো খুলে বগলের নিচে রেখেছেন, সেগুলো আর কোথাও রাখছেন না। জুতো নিয়েই মঞ্চে দাঁড়িয়ে গেছেন।

কেউ কেউ এগিয়ে এসে বললো, 'হুজুর! জুতোজোড়া আমার কাছে দিন, আমি সাবধানে কোথাও রেখে দিচ্ছি।'

মাওলানা কাসেম বললেন, 'না না, এখানে শিয়া আছে। এখানে জুতো রাখা নিরাপদ নয়।'

সবাই অবাক। মানে কী? একজন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে জুতো নিরাপদ নয় কেন?'

মাওলানা কাসেম সবাইকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 'শিয়ারা জুতো চুরি করে থাকে। এ কাজে তারা উস্তাদ।'

শিয়া আলেমগণ মাওলানার কথায় অবাক হলেন এবং উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছেন আপনি এসব? কোথায় দেখেছেন শিয়াদের জুতো চুরি করতে? কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে?'

মাওলানা কাসেম বললেন, 'কেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মজলিস থেকে একজন শিয়া জুতো চুরি করেছিলো, আপনারা জানেন না?'

শিয়া আলেম তাজ্জব হয়ে বললেন, বলেন কী! রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় শিয়া মতবাদ বলে তো কিছু ছিলোই না। তখন শিয়া আসবে কোত্থেকে! আপনি দেখছি এই সামান্য ইতিহাসও জানেন না।

'মাফ করবেন, আমি ভুল বলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জামানায় নয়, ব্যাপারটি ঘটেছিলো সাহাবিদের জামানায়। সাহাবাগণ পাশে জুতো রেখে তালিমে মশগুল ছিলেন, এমন সময় একজন শিয়া এসে তাদের জুতো চুরি করে নিয়ে যায়।

'কী যা তা বলছেন! এমন ঘটনা ঘটতেই পারে না। কারণ সাহাবিদের জামানায়ও কোনো শিয়া ছিলো না।'

'ওহ হো, আমার তাহলে স্মরণে নেই। তবে তাবেয়িনের জামানা নিশ্চয় কোনো শিয়াগোষ্ঠী ছিলো, যারা জুতো চুরি করতো।'

'মাওলানা সাহেব, তাবেয়িনদের সময়কালেও শিয়ারা ছিলো না।'

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না, সম্ভবত ঘটনাটি ঘটেছিলো তাবে-তাবেয়িনের জামানায়।'

'আপনি ভুল বলছেন, এদের সময়ও শিয়া ছিলো না। কারণ শিয়া মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে এদের সময়ের অনেক পরে। ওই সময় যখন শিয়াদের অস্তিত্বই ছিলো না, তখন তারা জুতো চুরি করবে কীভাবে?'

এবার মাওলানা কাসেম নানুতাভি (রহ.) বলেন, 'এই যে চারটি জামানার কথা বললেন, এর সাথে আমাদের শরিয়তের কী রূপ সম্পর্ক, বলতে পারেন?'

শিয়া আলেম আগ বাড়িয়ে বললেন, 'নিশ্চয় বলতে পারি। এই চার জমানার দেওয়া ব্যাখ্যার ওপর শরিয়তের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই সময় যা স্বীকৃত ছিলো তা-ই শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত। শরিয়তের ভিত্তিই হলো রাসুলের জমানা, তারপর সাহাবাদের জমানা, তারপর তাবেয়িন ও তাবে-তাবেয়িনের জমানা।'

মাওলানা কাসেম নানুতাভি (রহ.) এবার জনতার দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 'খেয়াল করে শুনুন সবাই! এই শিয়া আলেমের স্বীকারোক্তিই আমি দলিল হিসেবে পেশ করছি। তিনি বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবি, তাবেয়িন এবং তাবে-তাবেয়িনের জমানায় কোনো শিয়া ছিলো না। এ সময়ে শিয়া মতবাদের সৃষ্টিই হয়নি। তাহলে কি আপনারা সেই মতবাদ গ্রহণ করেননি, যা এই চার জামানার পরে সৃষ্টি হয়েছে এবং তা নিঃসন্দেহে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য? আপনাদের বক্তব্যই প্রমাণ করে, আপনারা ভ্রান্ত এবং বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী। কারণ, যে দলের সঙ্গে ইসলামের এই চার সময়কালের কোনো সম্পর্ক নেই, সে দলের সত্যপন্থী হওয়া গোমরাহি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

এ কথা শুনে শিয়া পণ্ডিতরা নির্বাক হয়ে গেলেন। কোনো জবাব নেই। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। শিয়া জনতাও স্তব্ধ।

মাওলানা কাসেম নানুতাভি (রহ.) এবার বগল থেকে জুতো বের করে পায়ে পরলেন এবং স্তব্ধ জনতার মধ্যে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে অনুষ্ঠান থেকে বাইরে চলে এলেন। তার অবয়বে বিজয়ের অহংকার নেই, বাহাদুরির ছাপ নেই, নেই কোনো খ্যাতি-যশের আত্মম্ভরিতা। জলসা পেছনে রেখে তিনি নিজের পথে চলে গেলেন।

প্রশ্ন চতুষ্টয়

তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। যিনি ইসলামের ইতিহাসে ইবনে আব্বাস নামেই সমধিক পরিচিত। ইসলামের একজন ব্যাখ্যাকার হিসেবে তার প্রসিদ্ধি এবং গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনবিদিত। ইসলামের জ্ঞানগত যেকোনো সমস্যায় তার সমাধান ছিলো উম্মতে মুসলিমার আলোকবর্তিকা।

প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম চাচা হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন তিনি। খুব ছোট বয়স থেকেই হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনের দৃশ্যপট খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

এ কারণে পরবর্তী জীবনে সুন্নতে নববির তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ অনুসারী। সাহাবাদের সময়কালে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ব্যুৎপত্তি অর্জনে তিনি নিজেকে তুলে ধরেন এক অনন্য উচ্চতায়। আজও তিনি বিশ্বের ইতিহাসে 'রইসুল মুফাসসিরিন' বা শ্রেষ্ঠ তাফসিরকার হিসেবে পরিজ্ঞাত। ইসলামের সর্ববিদ্যায় তিনি ছিলেন সমানভাবে পারদর্শী। খোলাফায়ে রাশেদিন এবং তৎপরবর্তী যতোদিন তিনি জীবিত ছিলেন, সে সময় উম্মতে মুসলিমা কোনো জ্ঞানগত সংকটে পড়লে নির্দ্বিধায় চলে

আসতেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। তিনি সমস্যার নির্ভুল সমাধান বাতলে দিতেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামল ছিলো তখন। আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জনৈক খৃস্টান পাদ্রি পত্রের মাধ্যমে চারটি প্রশ্ন লিখে পাঠান এবং এ কথাও লিখে দেন, প্রশ্নের উত্তর শুধু চিন্তাভাবনা করে দিলেই হবে না, বরং প্রতিটি উত্তর ঐশীগ্রন্থের আলোকে দিতে হবে।

প্রশ্নগুলো ছিলো এমন–

প্রথম প্রশ্ন : এক মায়ের পেট থেকে দুটি ছেলেসন্তান একই দিন জন্মগ্রহণ করেছে এবং একই দিন তারা দুজনই ইন্তেকাল করেছে। তা সত্ত্বেও এক ভাইয়ের বয়স একশো বছর বেশি আর অপর ভাইয়ের বয়স একশো বছর কম। এই দুই ভাইয়ের নাম কী? বাস্তবেই কি এমনটি ঘটা সম্ভব?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : সেটি কোন স্থান, যেখানে দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মাত্র একবার সূর্যের আলো পড়েছিলো। এর আগে সে স্থানে কোনো দিন সূর্যের আলো পড়েনি আর তার পরেও আর কোনো দিন সেখানে সূর্যের আলো পড়বে না।

তৃতীয় প্রশ্ন : সেটি কোন কবর, যার মধ্যকার লাশও ছিলো জীবিত এবং সে কবরটিও ছিলো জীবন্ত এবং ভ্রাম্যমাণ? যে কবর তার মধ্যকার জীবিত লাশ নিয়ে ঘোরাফেরা করেছে। আবার সে কবর থেকে ওই কবরস্থিত ব্যক্তি বের হয়ে এসে স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছে এবং পুনরায় সে স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেছে। সে কবর কোনটি এবং তার মধ্যকার লাশটি কার ছিলো?

চতুর্থ প্রশ্ন : সে কোন ব্যক্তি, যে বন্দী হয়েছিলো এমন স্থানে, যেখানে শ্বাস-প্রশ্বাস নিষিদ্ধ। সেখানে বন্দী হয়ে সে শ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়েও বেঁচে ছিলো। বন্দী ব্যক্তির নাম কী এবং এই কারাগার কোথায় অবস্থিত?

এই চারটি প্রশ্ন-সংবলিত পত্রটি পেয়ে আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রইসুল মুফাসসিরিন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন এবং বললেন, পাদ্রির এ প্রশ্নগুলোর উত্তর ঐশীগ্রন্থের আলোকে লিখে দিতে হবে। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে সাথে কাগজ-কলম হাতে নিয়ে সেখানেই উত্তর লিখতে বসে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ সকল প্রশ্নের উত্তর লিখে দিলেন।

উত্তরগুলো ছিলো এমন–

প্রথম প্রশ্নের উত্তর : প্রথম যে দুই ভাই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে দুই ভাই হচ্ছেন হজরত উজাইর আলায়হিস সালাম এবং তার ভাই। তারা দুজন একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ দুনিয়াবাসীকে তার আপন কুদরত দেখানোর জন্য যুবক বয়সে হজরত উজাইর আলায়হিস সালামকে মৃত্যুদান করে একশো বছর পর পুনরায় জীবিত করেছিলেন।

দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে তিনি নিজের বাড়ি যান এবং তার পরও বেশ কিছুদিন তিনি জীবিত ছিলেন। অতঃপর তিনি এবং তার ভাই একই দিন ইন্তেকাল করেন। এভাবে হজরত উজাইর আলায়হিস সালামের বয়স একশো বছর কম এবং তার ভাইয়ের বয়স একশো বছরের বেশি। পবিত্র কোরআন মজিদের সুরা বাকারায় এর বর্ণনা রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : যে স্থানে পৃথিবীর শুরু থেকে এ-যাবৎ সূর্যের আলো মাত্র একবার পড়েছিলো এবং অতীতে আর কোনো দিন সেখানে সূর্যের আলো পড়েনি এবং ভবিষ্যতেও পড়বে না, সে স্থানটি হলো লোহিত সাগরের তলদেশ। যেখানে ফেরাউন নিজ সৈন্য-সামন্তসহ ডুবে মরেছিলো এবং হজরত মুসা আলায়হিস সালাম নিজের উম্মত বনি ইসরাইলদের নিয়ে পার হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক নিজ কুদরতে নদীর পানি সরিয়ে তার মধ্য দিয়ে হজরত মুসা আলায়হিস সালামের জন্য রাস্তা করে দিয়েছিলেন। আর তখনই সেখানে সূর্যের আলো পড়েছিলো। এ ঘটনাটি পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর : যে কবর জীবিত ছিলো, তার মধ্যকার লাশও জীবিত ছিলো এবং কবর তার মধ্যকার লাশ নিয়ে ঘোরাফেরা করেছে, সে কবর হলো হজরত ইউনুস আলায়হিস সালামকে উদরে ধারণকারী মাছ। সে মাছ নিজেও জীবিত ছিলো এবং তার পেটে হজরত ইউনুস আলায়হিস সালামও জীবিত ছিলেন। মাছটি তাকে নিয়ে সাগরবক্ষে ঘোরাফেরা করেছে। অতঃপর হজরত ইউনুস আলায়হিস সালাম মাছের পেট থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে এসে এক সুদীর্ঘ সময় দুনিয়ায় জীবিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেন। এ ঘটনাও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর : যে কয়েদি বন্দিশালায় শ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়েও জীবিত থাকে, সে হলো মায়ের পেটের শিশু। পবিত্র কোরআন মাজিদে গর্ভস্থিত শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের আলোচনা করা হয়েছে। মায়ের পেটে শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়াই জীবিত থাকে।

প্রশ্নগুলোর ত্বরিত জবাব দেয়ায় আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অবাক হয়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্নের জবাবগুলো খৃস্টান পাদ্রির নিকট প্রেরণ করেন। খৃস্টান পাদ্রি প্রশ্নগুলোর জবাব পড়ে হতভম্ব হয়ে যান। কারণ তার ধারণা ছিলো, এমন জটিল প্রশ্নের জবাব দেয়া হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু এতো অল্প সময়ে যথেষ্ট ও বিস্তারিত জবাব পেয়ে তিনি হতবাক হয়ে যান।

সমাপ্ত
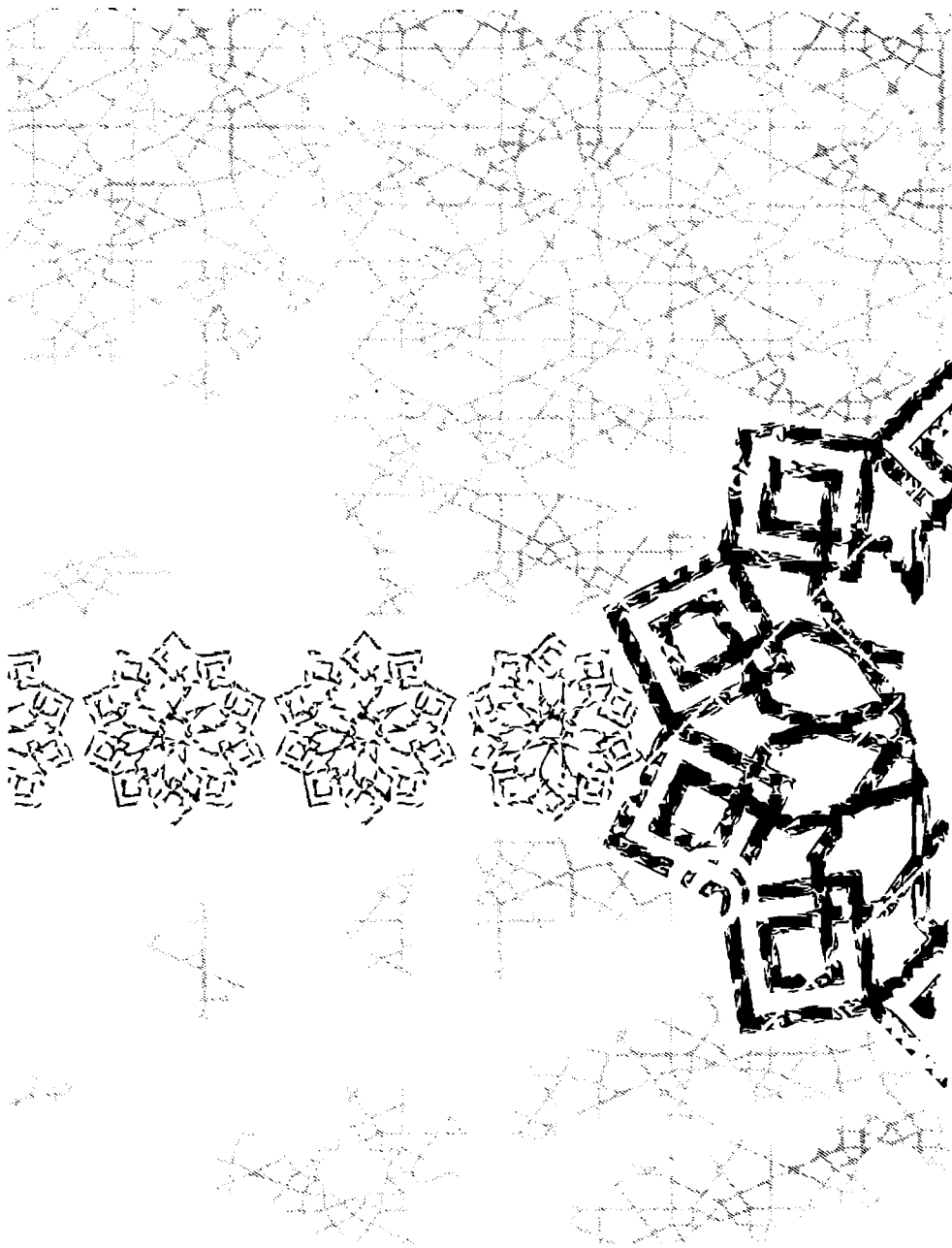
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

বাবা মো. শওকত হোসেন ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক। ছোটবেলায় তাই সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর-এর অকালপক্ক ইচ্ছে ছিলো সৈনিক হবার। ওই বয়সেই লেফট-রাইট, দড়াম আওয়াজের স্যালুট আর বিকেলবেলা সেনানিবাসে বাজানো করুণ বিউগল একরকম মোহিত করেই রেখেছিলো তাকে। কিন্তু মা জাহানারা বেগমের ইচ্ছে ছিলো ছেলেকে হাফেজ বানানোর। সুতরাং রাইফেল-উর্দির স্বপ্নকে বেকসুর খালাস দিয়ে তাকে ভর্তি হতে হয়েছিলো হেফজখানায়।
ঢাকা জেলার একদম পশ্চিমের থানার নাম ধামরাই। যে হেফজখানায় ভর্তি হয়েছিলেন সেটি তার গ্রাম বাউজার কাছেই– বাসনা আমানুল্লাহ ফোরকানিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা। সত্যি বলতে, ওই হেফজখানাই ছিলো তার লেখালেখির রসদ যোগানোর প্রথম বারুদখানা। বড় এক আলমারিভরা ছিলো নানান স্বাদের বই; পড়ার সাধারণ অনুমতি ছিলো ছাত্রদের জন্য।
লেখালেখির প্রাথমিক কসরৎটা অবশ্য হয়েছিলো বড়বোনের সঙ্গে, তবে চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে দিয়েছিলো ওই এক আলমারিভরা বই। তাই হাফেজ হওয়ার পর বাবা যখন বললেন, স্কুল বা মাদ্রাসা–পরবর্তী শিক্ষার যে কোনো একটি বেছে নেয়ার অধিকার তোমার আছে। তখন কাঙ্ক্ষিত শিক্ষায়তন বেছে নিতে তার কষ্ট হয়নি। কারণ ততোদিনে তার পড়া শেষ হয়ে গেছে নসিম হিজাজির সবগুলো উপন্যাস।
প্রাথমিক মাদ্রাসাশিক্ষা নিয়েছেন ধামরাইয়ের জামিয়া ইসলামিয়া হাফিজুল উলুম ইসলামপুর থেকে। এরপর ঢাকা আগমন ২০০২ সালে। মাধ্যমিক স্তর পড়েছেন মাদ্রাসায়ে দারুল উলুম মিরপুর-এ। ২০০৮ সালে দাওরায়ে হাদিস পাস করেন জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ থেকে। মাঝে ২০০৭ সালে আলিম পাস করেন ধামরাইয়ের শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে। পরবর্তীতে ইংরেজিতে অনার্স করেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে মাস্টার্স অধ্যয়নরত।
কর্মজীবনে প্রধান সম্পাদক ছিলেন ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার-এ, সাড়া জাগানো সাপ্তাহিক লিখনীর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন বেশ কিছুদিন।